প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি-এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৫৫

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫নং বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্গীয় বেণীমাধব বসু-মল্লিকের

শ্রীচরণে—

নিবেদন

বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব্বের সর্ব্বপ্রধান নায়ক ছিলেন। কেবল বিপ্লবী বলিয়া নয় সন্ন্যাসী ভোলানন্দ গিরির অন্যতম শিষ্য হিসাবে তাঁহার গুরু ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট তিনি পূজনীয়। তাঁহার জীবন কাহিনী এযাবৎ লিখিবার উপায় ছিল না; কিন্তু ভারতের বন্ধন মুক্তির পর আজ আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে বাধা নাই।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ্য; তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, যতীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। এবং তদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইহা রচনা করিতে আমি অগ্রসর হই।

ভোলানন্দ আশ্রমের শ্রীমদ্ স্বামী রামানন্দ গিরি মহারাজ যতীন্দ্রনাথের অন্যতম গুরুভ্রাতা, তিনি এই পুস্তক প্রকাশে আমায় বহু অপ্রকাশিত তথ্য দিয়া সহায়তা করেন; তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়।

যতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবী বহু ঘটনা আমার পুস্তকে দিবার জন্য বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

যতীন্দ্রনাথের মাতুল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "ভারতের বিপ্লব কাহিনী" হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'ভারত' পত্রে যতীন্দ্রনাথের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা

হইতেও অনেক ঘটনা অবগত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি।

যতীন্দ্রনাথ তাঁহার নাম "জ্যোতিন্দ্রনাথ" এইরূপ বানান করিতেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ নামটি সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় আমরা যতীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বানান পরিত্যাগ করিয়াছি। তাঁহার গুরুদেব ২১১ নং হ্যারিসন রোডে অবস্থান করিতেন এবং এই স্থানেই গভীর রাতে যতীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। সম্প্রতি হ্যারিসন রোডের নাম "ভোলাগিরি রোড" নামে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি প্রস্তাব হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছি।

যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনা করিলাম, তাঁহাদের নিকট ইহা আদৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

বন্দেমাতরম্

'মিত্র কুটির'
২, কালী লেন, কলিকাতা
৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

এক

বাঙ্গলাদেশে বৈপ্লবিক ইতিহাসের দ্বিতীয়

ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শরৎশশী দেবী; যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার রিশখালি গ্রামে তাঁহাদের আদি নিবাস হইলেও যতীন্দ্রনাথ ১১৮৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্ঠিয়া মহকুমার 'কয়া' নামক একটি গণ্ডগ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হওয়ায় মাতুলালয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার মাতুল-বংশ কয়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবার ঐ অঞ্চলে উদার মনোবৃত্তির জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ; অধিকন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনে এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহাদের বাডীব চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহের যুবক ও মহিলাগণের যে কত শত সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক এইরূপ সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবেশের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মানুষ হন।

যতীন্দ্রনাথের মাতা ছিলেন একজন আদর্শ হিন্দুনারী, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষায় যতীন্দ্রনাথ উত্তরকালে একজন পরোপকারী ব্যক্তি বলিয়া প্রখ্যাত হন। বাল্যে রামায়ণ মহাভারতের বীর-গাথাসমূহ শুনাইয়া যতীন্দ্রনাথের মাতা শরৎশশী দেবী শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বের ভাব সঞ্চার করিয়া দেন। মায়ের আদেশ যতীন্দ্রনাথের নিকট অলঙ্ঘনীয় ছিল এবং তাঁহার আদেশে তিনি যে কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা 891.443
পরিগ্রহণ সংখ্যা

কয়া গ্রামের পাশ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহার নাম গড়ুই নদী; যতীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে এই নদীতে সাঁতার কাটিতেন এবং নির্ভয়ে বহুবার এই নদী পারাপার করিতে পারিতেন। তাঁহার মামার একটি সাদা রঙ্গের ঘোড়া ছিল, যতীন্দ্রনাথ সেই ঘোড়াটিকে খুব ভালবাসিতেন ও ছেলেবেলা হইতে সেই ঘোড়াতে চড়িতেন এবং প্রায়ই তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বহু দূর পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাইতেন।

যতীন্দ্রনাথের ন-মামার নাম অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, তিনি নদীয়া মহারাজার কলিকাতার এজেণ্ট এবং বঙ্গীয় সরকারের সহকারী অনুবাদক ছিলেন। তাঁহার একটি বন্দুক ছিল, তিনি যতীন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই যতীন্দ্রনাথ বন্দুক চালনা শিক্ষা করেন। তাঁহার ছোট মামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে খুব সুন্দর ভাবে সাঁতার এবং নৌকা চালান শিখাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের বড় মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরের অন্যতম প্রধান উকিল ছিলেন; কয়া গ্রামে ভাল ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায়, তিনি তাঁহার বড় মামার নিকট কৃষ্ণনগরে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। খেলাধূলার ন্যায় পড়াশুনায়ও তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি খুব সাহসী ছিলেন, এবং ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, দৌড়ান, বন্দুক চালনা করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন এবং এই পিতৃহীন বালক যাহাতে 'মানুষ' হইয়া উঠিতে পারে, সেই দিকে তাঁহার মাতুলদেরও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত।

কৃষ্ণনগর এ্যাংলো ভার্ণেকুলার স্কুলে যতীন্দ্রনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয়;

এই স্কুলে তখন কোন ব্যায়ামাগার ছিল না। যতীন্দ্রনাথ পড়াশুনার ন্যায় ব্যায়াম চর্চ্চাও প্রত্যেক বালকের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। নিকটস্থ কৃষ্ণনগর কলেজের সুন্দর ব্যায়ামাগার এবং আধুনিক ব্যায়ামের সকল রকম সাজসরঞ্জাম দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ উক্ত ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হন। অথচ কলেজে না পড়িলে উক্ত স্থানে কাহাকেও ব্যায়াম করিতে দেওয়া হইত না। যতীন্দ্রনাথের তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে তিন-চার বৎসর দেরী ছিল; অতদিন দেরী করা তাঁহার পক্ষে তখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি একদিন কৃষ্ণনগর কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মিঃ বিলির (Prof. W. Billy) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদের কলেজের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করিবার অনুমতি দিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বিলি সাহেব ছাত্রদের বিশেষভাবে ভালবাসিতেন, একটি বালক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সাহস করিয়া তাহার নিকট কথা বলিতে আসায়, তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং তিনি যতীন্দ্রনাথকে উক্ত কলেজে ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার জন্য অনুমতি দেন। তখন কৃষ্ণনগর কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তিনিও যতীন্দ্রনাথকে খুব ভালবাসিতেন এবং আধুনিক ব্যায়ামের নানাবিধ কৌশল তিনিই তাঁহাকে শিখাইয়া দেন। যতীন্দ্রনাথের সুগঠিত সুন্দর দেহ তাঁহার কৌশলে গড়িয়া উঠে এবং সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে যে কোন প্রকারের পরিশ্রম করিতে, তিনি কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না।

কৃষ্ণনগরের উকিল বারাণসী রায়ের একটি নূতন ঘোড়া কেনা হইয়াছিল ঘোড়াটিকে সহিস কোন রকমেই বাধ্য করিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ ঘোড়াটি আস্তাবল হইতে কোন প্রকারে বাহির হইয়া যায় এবং

ধরিতে যাইলে ঘোড়াটি লাফাইতে লাফাইতে সহরের বড় রাস্তা দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে এবং বহু লোককে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। 'পালাও' 'পালাও' বলিয়া সকলেই খুব চিৎকার করিতে থাকে এবং রাস্তায় ভীষণ সোরগোল উত্থিত হয়। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় পেন্সিল কিনিবার জন্য বাজারের রাস্তার উপর নদীয়া ট্রেডিং কোম্পানী নামক একটি মনোহারী দোকানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোলমাল শুনিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া যতীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন যে, একটি ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিতেছে এবং রাস্তার সমস্ত লোক যে যেদিকে পারিতেছে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে; কেহই তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইতেছে না। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঘোড়াটিকে না ধরিলে মানুষের বিপদ হইতে পরে এই ভাবিয়া, তিনি সেই দোকানের সম্মুখ দিয়া যেমন ঘোড়াটি ছুটিয়া যাইবে, অমনি চকিতের মধ্যে দোকানের রোয়াক হইতে তিনি ঐ ধাবমান ঘোড়াটির সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার কাঁধের চুল ধরিয়া ঘোড়াটিকে আটকাইয়া দিলেন। সকলে কলরব করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখিল যে, যতীন্দ্রনাথ হাসিতেছে; তাঁহাকে বৃদ্ধগণ ভৎ´সনা করিতে লাগিল, যুবকগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল, আব বালকগণ যতীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না; তিনি নদীয়া ট্রেডিং কোম্পানী হইতে তাড়াতাড়িতে পেন্সিল লইতে ভুলিযা গিয়াছিলেন, পুনরায দোকানে যাইয়া পেন্সিলটি লইলেন, তাহার পর আর কোন কথা না বলিয়া ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করিতে চলিয়া গেলেন।

একবার কুষ্টিয়ার খেয়াঘাট পার হইয়া যতীন্দ্রনাথ কয়াগ্রাম মাতুলালয়ে যাইতেছিলেন। নৌকা হইতে নামিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃদ্ধা ঘাসের একটি বোঝা তাহার মাথায় তুলিয়া দিবার জন্য বহু লোককে

অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিতেছে না। যতীন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধা তাঁহাকে বোঝাটি মাথায় তুলিয়া দিতে বলিল। তিনি ঘাসের বোঝাটি বৃদ্ধার মাথায় তুলিয়া দিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, বোঝাটি প্রায় এক মণের উপর ভারী। যতীন্দ্রনাথের হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল, তিনি বৃদ্ধাকে ঐ ভারী মোট লইয়া কতদূরে যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধা বলিল যে তাহাকে আধ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। এতখানি পথ ঐ ভারী বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধার পক্ষে কষ্টকর বিবেচনা করিয়া, তিনি বৃদ্ধার মাথা হইতে সেই বোঝাটি নিজের মাথায় চাপাইয়া লইয়া পথ চলিতে সুরু করিলেন এবং বৃদ্ধার বাড়ীতে বোঝা পৌছাইয়া দিয়া তবে কয়ায় যাইলেন। বাল্যকাল হইতে কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, যে কোন উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতেন; কাহারও কোন বাধা মানিতেন না।

প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় যতীন্দ্রনাথের মাতুলালয়ে খুব ধুম-ধাম হইত এবং তদুপলক্ষে তিন দিন যাবৎ বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন করান হইত। যতীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে পূজার সময় তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবদের লইয়া বড় বড় চুলা কাটিয়া প্রত্যহ আট-দশ মণ চাউলের ভাত রান্না করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে পরিবেশন পূর্ব্বক তবে নিজে বিশ্রাম করিতেন। এই কার্য্যে কখনও কেহ তাঁহাকে ক্লান্ত হইতে দেখে নাই। তাহার কষ্টসহিষ্ণুতা যেরূপ ছিল, তাহা সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে তিনি কেবল সকলের প্রিয় ছিলেন না, তাহাদের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তাঁহার অসমসাহসিকতার কথা

শুনিয়া সমগ্র ছাত্রই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। খেলাধূলা, উলম্ফন এবং দৌড়াইতে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী যুবক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যাইত এবং তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ছাত্রমহলে তিনি "যতীন-দা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের প্রত্যেককেই তিনি শরীর চর্চ্চা করিতে বলিতেন এবং তাহাদিগকে ব্যায়াম করিতে সহায়তা করিতেন। তিনি তাঁহার ব্যায়াম শিক্ষক সুরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে যে সমস্ত চমকপ্রদ ক্রীড়ার কৌশলাদি শিখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই প্রায় বন্ধুগণের নিকট দেখাইয়া যতীন্দ্রনাথ সকলকে বিস্মিত করিয়া দিতেন।

যতীন্দ্রনাথের অন্তঃকরণ একদিকে পাথরের ন্যায় কঠিন এবং অন্যদিকে কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল। অত্যাচার ও অবিচার তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, তাহার প্রতিবিধান করিতে না পারিলে, তিনি মনে বড় অশান্তি ভোগ করিতেন। একবার কৃষ্ণনগর স্কুলের কয়েকজন দুষ্ট ছাত্র একটি ছাত্রের কয়েকখানি পুস্তক কাড়িয়া লয়। ছাত্রটি তখন বিদ্যালয়ে নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের নিকট বহুবার পুস্তকগুলি চাহিযা, ফেরং পায় নাই। দুষ্ট ছাত্রগুলি তাহা-দিগকে খাইবার জন্য কিছু পয়সা না দিলে, তাহারা পুস্তক দিবে না বলে, অথচ সেই ছাত্রটির নিকট তখন কোন পয়সা ছিল না।

বিদ্যালয়ের ছুটির পর তাহারা বালকটিকে পুস্তক না দিয়া চলিয়া যায় এবং বলিয়া যায় যে আগামী কল্য পয়সা আনিয়া দিলে তবে পুস্তকগুলি ফেরৎ পাইবে। বালকটি ছুটির পর স্কুলের সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, কারণ পুস্তক না লইয়া বাড়ী যাইলে, বাড়ীতেও তাহাকে বকুনি খাইতে হইবে। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় স্কুল হইতে বাহির হইবামাত্র বালকটিকে

কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বালকটির নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। দুষ্ট বালকগুলি তখন বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল এবং নূতন বালকটিও তাহাদের সকলের বাড়ী জানিত না। যতীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই অসম্ভব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ স্কুলে ফিরিয়া গেলেন এবং স্কুলের রেজিষ্টারী হইতে তাহাদের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুস্তকগুলি উদ্ধার করিয়া বালকটিকে দিয়া তবে বাড়ী ফিরিলেন।

সত্যকথা বলিতে কখনও যতীন্দ্রনাথ পশ্চাদপদ হইতেন না। একবার স্কুলে টিফিনের সময় ক্লাসের মধ্যে একটি ছোট বল লইয়া লোফালুফি করিতে করিতে বলটি ছিটকাইয়া গিয়া একটি জানালায় লাগে এবং জানালার একখানি কাঁচ তাহাতে ভাঙ্গিয়া যায়। শিক্ষক মহাশয় ক্লাশে আসিয়া কে জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। প্রকৃত পক্ষে চার-পাঁচ জনে মিলিয়া খেলিতে খেলিতে যতীন্দ্রনাথের হাত হইতেই বলটি জানালায় গিয়া লাগে এবং ভাঙ্গার জন্য কাহারও নাম বলিতে হইলে তাঁহারই নাম বলিতে হয়, সুতরাং তাঁহার ভয়ে সকলেই চুপ করিয়া থাকে, কে যে কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। শিক্ষক মহাশয় বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোন সদুত্তর পাইলেন না, তখন তিনি ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রকে এক টাকা করিয়া জরিমানা করেন।

যতীন্দ্রনাথ তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার দোষে অন্য নির্দ্দোষী ছাত্রদল কেন সাজা গ্রহণ করিবে? তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া "আমি ভেঙ্গেছি স্যার" বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। শিক্ষক মহাশয় তাহাকে প্রধান শিক্ষকের নিকট লইয়া গিয়া

যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিলে, প্রধান শিক্ষক তাঁহার সত্যবাদীতায় বিশেষ তুষ্ট হইয়া, যতীন্দ্রনাথকে ঐরূপ ক্লাসের মধ্যে খেলাধূলা না করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া ছাড়িয়া দেন। স্কুলে ছাত্রদের যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য সব সময় "যতীন দা"র ডাক পড়িত এবং তিনি তাহা সুন্দরভাবে মিটাইয়া দিতেন এবং নিজেদের মধ্যে ঐরূপ ঝগড়া না করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেন।

রোগীর সেবা করিবার জন্য তিনি ছাত্রদের লইয়া একটি সেবাদল গঠন করিয়াছিলেন এবং কাহারও বাড়ীতে রোগীর শুশ্রূষা করিবার লোকাভাব শুনিতে পাইলে, তিনি তাঁহার দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন এবং যতদিন না সেই রোগী রোগমুক্ত হইত, ততদিন রাত্রে পালা 'করিয়া তাঁহারা উহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।

একবার কয়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে বাঘের উপদ্রব হইয়াছিল, বাঘটি বহু গুরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তুকে মারিয়া ফেলে ; কিন্তু কেহই তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারে নাই। বাঘটির ভয়ে রাস্তা ঘাটে বাহির হওয়া বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। অবশেষে যতীন্দ্রনাথের এক মামাতো ভাই (ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়) বন্দুক লইয়া বাঘটিকে মারিবার বন্দোবস্ত করেন। ফণিবাবু বাঘটিকে মারিতে যাইবেন, সেইদিন ঘটনাক্রমে যতীন্দ্রনাথ কয়ায় আসেন। তিনি কৃষ্ণনগরে থাকিতেন, বাঘের উৎপাতের কথা কিছুই জানিতেন না। কয়ায় আসিয়া তাঁহার ফণিদা' বাঘ মারিতে যাইতেছেন শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন, এবং তিনিও ফণিবাবুর সহিত যাইতে মনস্থ করিলেন।

যতীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন,

কারণ বাড়িতে তখন একটি বন্দুক ছিল এবং তাহা ফণিবাবু লইয়া যাইতেছেন, সুতরাং খালি হাতে যতীন্দ্রনাথ কি করিয়া যাইতে পারেন? কিন্তু যতীন নাছোড়বান্দা, বাঘ মারিতে তাহাকে যাইতেই হইবে, কাহারও কথা না শুনিয়া তিনি আত্মরক্ষার জন্য একখানি 'ভোজালি' হাতে লইয়া ফণিবাবুর সঙ্গে বাঘ শিকার করিতে গেলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা বাঘ শিকার করিতে বাহির হইলেন; তাঁহারা বাঘশিকার করিতে যাইতেছেন শুনিয়া গ্রামের বহু লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কাঁসর, কেহ ঘণ্টা, কেহ কানাস্তারা, কেহ শাঁক প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষ বাজাইতে বাজাইতে এই শিকারীর দল গ্রাম ছাড়িয়া জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় মাঠ ছিল, যতীন্দ্রনাথ সেই মাঠে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। সঙ্গের লোকজন জঙ্গলের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মামাতো ভাইও একটি স্থান ঠিক করিয়া তথায় বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই দিক দিয়া একটি প্রকাণ্ড বাঘ বাহির হইবামাত্র লোকজন ছুটিয়া পলাইতে লাগিল; ফণিবাবু বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িলেন; গুলী বাঘের মাথায় সামান্যর জন্য লাগিল না, তাহার মাথার উপর ঘর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। ঐ গুলীতে বাঘ আহত না হইয়া বরং আরো উত্তেজিত হইয়া যতীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিল। যতীন্দ্রনাথ সাহসে ভর দিয়া বাম বগলের মধ্যে বাঘের গলাটি চাপিয়া ধরিয়া, বাঘের মাথার

উপরে প্রাণপণ শক্তিতে ভোজালি দিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। বাঘটিকে গুলী মারিবার জন্য ফণিবাবু পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঘটির সহিত যতীন্দ্রনাথ যে ভাবে লড়াই করিতেছিলেন, তাহাতে গুলী মারা আর সম্ভব ছিল না কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই সেই গুলী যতীন্দ্রনাথের গায়ে লাগিয়া যাইবে।

প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া লড়াই করিয়া যতীন্দ্রনাথ বাঘটিকে আহত করিলেন; বাঘও উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যতীন্দ্রনাথকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহুভাবে তিনি নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অবশেষে অবসন্ন হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ইত্যবসরে বাঘটি তাঁহার হাঁটুতে কামড়াইয়া নখ দিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাহার আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, কুস্তিগীররা যেরূপ মাটিতে পড়িয়া যাইলে উভয়ে উভয়কে জাপটাইয়া একজন আর একজনের বুকের উপর বসিবার চেষ্টা করে; যতীন্দ্রনাথও তদ্রূপ আহত অবস্থায় বাঘটিকে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া ছোরার আঘাত করিতে লাগিলেন। বাঘ ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাহাতে ভীত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, বাঘটিকে একেবারে মারিয়া না ফেলিলে তাহার নিস্তার নাই, তিনি ছোরার দ্বারা বাঘের সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন এবং নিজেও তারপর মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

ফণিবাবু দৌড়াইয়া আসিয়া যতীন্দ্রনাথের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পরে লোকজনের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথের আহত দেহ এবং মৃত ব্যাঘ্রটিকে তিনি বাড়ীতে লইয়া গেলেন। গ্রামের ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর যতীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায়

লইয়া যাইতে বলিলেন। যতীন্দ্রনাথের মেজ মামা (হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) কলিকাতা ২৭৫নং আপার চিৎপুর রোডে (শোভাবাজার) ডাক্তারি করিতেন। অবশেষে তাঁহার নিকট যতীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য পাঠান হইল।

তিনি যতীন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া ভয়ানক ভয় পাইয়া গেলেন এবং কলিকাতার তৎকালীন সুবিখ্যাত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্জ্জেন ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর উপর তাঁহার চিকিৎসার ভার দিলেন। বাঙ্গলাদেশে প্রবাদ আছে যে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা" অর্থাৎ বাঘে এক জায়গায় নখ বসাইয়া দিলে শরীরের আঠারো জায়গায় তাহার বিষের জন্য ক্ষত হয়। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের শরীরে প্রায় তিনশত ক্ষত ছিল এবং তাঁহার হাঁটুতে বাঘ এরূপ ভাবে কামড়াইয়াছিল যে, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাঁহার দুইটি পা-ই হয়ত কাটিয়া ফেলিতে হইতে পারে বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুচিকিৎসা এবং মামাদের আপ্রাণ যত্নে তাঁহার পা দুখানি আর শেষ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হয় নাই। বিধবার এই একমাত্র পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী যে কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টা করেন, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ছয় মাস চিকিৎসার পর তিনি শয্যার উপর বসিতে পারিতেন এবং প্রায় এক বৎসর তিনি চলিতে সমর্থ হন নাই। ভাল হইয়াও তিনি বহুদিন যাবৎ হাঁটিতে পারিতেন না, স্ক্রাচের সাহায্যে তাঁহাকে সেই সময় চলা-ফেরা করিতে হইত।

ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী যতীন্দ্রনাথের অসমসাহসিকতার জন্য তাঁহাকে ভয়ানক ভালবাসিতেন এবং তিনি স্বহস্তে মারা বাঘের ছালখানি তাঁহার জীবনদাতা ডাক্তার সুরেশবাবুকে কৃতজ্ঞচিত্তে উপহার দেন। অদ্যাপি

উক্ত বাঘের ছালটি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর বংশধরগণের বাড়ীতে এবং ভোজালিটি যতীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে।

যতীন্দ্রনাথের সাহসিকতা ও ছোরা দিয়া বাঘ মারিবার জন্য তাঁহাকে 'বাঘা' বলিয়া কেহ কেহ ডাকিত; সম্ভবতঃ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি হরিদ্বারে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সামর্থ্য, প্রকৃতি ও সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে আদর করিয়া "শের-কা-বাচ্চা" (বাঘের বাচ্চা) এবং "শূরবীর" বলিতেন। বলা বাহুল্য যে শ্রীমদ ভোলানন্দ গিরি প্রদত্ত নামেই পরে তিনি সমগ্র দেশে প্রখ্যাত হন এবং "বাঘা যতীন" নামের সার্থকতা দেশবাসীকে দেখাইয়া যান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

"বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি
বৃথা শিক্ষা তার।"

অর্থাৎ মানুষের সন্তান যদি মানুষই না হইল, তাহা হইলে তাহার শিক্ষা বৃথা, কখনই তাহার শিক্ষা সার্থক হয় না। মানুষের পূর্ণ অভিব্যক্তি মনুষ্যত্বে—মনুষ্যত্বেই মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশ করে। শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিক্ষায় মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া যতীন্দ্রনাথের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় এবং তিনিই "বাঘের বাচ্চাকে" প্রকৃত বাঘ করিযা দেন।

যতীন্দ্রনাথের বাঘ মারিবার সময় তিনি কোথা হইতে যে অসীম ক্ষমতা লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা "ভোলানন্দ চরিতামৃত" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। পর পৃষ্ঠায় উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

ব্যাঘ্রকবলিত শিষ্যকে উদ্ধার

অলৌকিক ব্যবহার

শ্রীশ্রী স্বামীজীর জনৈক বাঙ্গালী শিষ্য (এই শিষ্যের নাম প্রকাশ করিতে লেখক অসমর্থ *) ব্যাঘ্র শিকারের জন্য সদলে বঙ্গদেশের এক গভীর অরণ্যে উপনীত। কিছুক্ষণ ব্যাঘ্রের অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা ব্যাঘ্রের কোনও খোঁজ পাইলেন না। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া তাহাদিগের উপরে পতিত হইতেই শ্রীশ্রী স্বামীজীর শিষ্য ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। শিষ্য পলায়ন করিবার অবকাশ পাইলেন না, কারণ ব্যাঘ্রে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনিও প্রাণপণে ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু হায়! তাঁহার হস্তে মাত্র একটি সড়কি, তাঁহার সঙ্গীগণ পলায়িত। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আর রক্ষা নাই, আজ তিনি ব্যাঘ্রকবলিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবেন। ব্যাঘ্রও ভীম বিক্রমে শিষ্যকে আক্রমণ করিয়াছে, তাঁহার হস্তপদ হইতে বিগলিত ধারায় রক্ত বাহির হইতেছে। তাঁহার শক্তি ও সাহস ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতেছে। হায়! এ বিপদে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে? হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীশ্রী স্বামীজী তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলিতেছেন "বেটা! ভয় নেই। বাঘকে জোরে মার, মুখের মধ্যে সড়কি মার, ও এখনও মরে নাই।"

শ্রীশ্রী স্বামীজীর আবির্ভাবে ও তেজোদৃপ্ত বাণীতে শিষ্যের শরীর

* যখন এই পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন যতীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল।

রোমাঞ্চিত হইল, তাঁহার সাহসও শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইল, তিনি অমিত বিক্রমে ব্যাঘ্রকে সড়কি ভরিয়া দিলেন। ব্যাঘ্রও অচিরে ক্ষীণশক্তি হইয়া শুইয়া পড়িল ও দেখিতে দেখিতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ব্যাঘ্রকে নিহত দেখিয়া শ্রীশ্রী স্বামীজীকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্য পশ্চাতে ফিরিলেন। কিন্তু কোথায় স্বামীজী! তিনি তখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। রোমাঞ্চিত কলেবর শিষ্য বুঝিলেন যে, তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শিব-স্বরূপ তাঁহার গুরুদেব এই গভীর জঙ্গলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী স্বামীজীর প্রতি ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি হরিদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রী স্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা আপনি আমাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গভীর জঙ্গলে আপনি আবির্ভূত না হ'লে সেদিন আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম।" তদুত্তরে শ্রীশ্রী স্বামীজী বলিলেন—"দূর বেটা! কি বলছ? আমি ত' তখন হরিদ্বারে ছিলাম, এ সব পরমাত্মার মায়া!" *

* শ্রীশ্রী ভোলানন্দ চরিতামৃত—স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ। পৃঃ ৪০১—৪০৩

দুই

আঠারো বৎসর বয়সে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর এ-ভি স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি কলেজে পড়িবার জন্য তাঁহার মেজমামার শোভাবাজারের বাড়ীতে কৃষ্ণনগর হইতে চলিয়া আসেন। শিক্ষাবিদ্ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয় প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল কলেজের তখন খুব সুনাম ছিল; তাঁহার মেজমামা হেমন্তবাবু যতীন্দ্রনাথকে ফার্ষ্ট-আর্টস (এফ-এ) পড়িবার জন্য সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

সেণ্ট্রাল কলেজে প্রায় বৎসরাধিক এফ-এ পড়িবার পর তিনি উপার্জ্জনক্ষম হইবার আশায় সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিখিতে আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথের মাতুলগণ তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন, তথাপি তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকা আর তিনি পছন্দ করিলেন না এবং সেই জন্যই তিনি কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন।

এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়া পড়ে। যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতার সুবিখ্যাত কুস্তিগীর ক্ষেত্রনাথ গুহের আখড়ায় ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং তথায় কয়েক মাস কুস্তি করিবার পর তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পান এবং তাঁহার শরীর তাহার পর খুব ভাল হইয়া যায়।

যতীন্দ্রনাথ কয়েকমাসের মধ্যেই সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং খুব ভাল করিয়া শিখিয়া কলিকাতায় অমহুটি এণ্ড কোম্পানী নামক এক ইউরোপীয় সওদাগরী অফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন।

সেই সময় একদিন তিনি অফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুটি কথায় কথায় তাহার মাতার অসুখের কথা বলে এবং অর্থাভাবে তাহার চিকিৎসা হইতেছে না এই কথা বলে। অর্থাভাবে মাতার চিকিৎসা হইতেছে না। শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই দিন মাস কাবার হইয়াছিল এবং তাঁহার মাহিনার টাকা সমস্তই পকেটে ছিল; তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া পকেট হইতে সমস্ত টাকা বাহির করিয়া তাঁহার বন্ধুর হস্তে দিয়া, তাঁহার মাতার সুচিকিৎসা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

বন্ধুটি টাকা লইয়া যাইবার পর যতীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে তাঁহার পকেটে আর খুচরা পয়সা কিছুই নাই; সমস্তই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছেন। সেদিন আর ট্রামে করিয়া তাঁহার বাড়ী যাওয়া হইল না, পয়সাভাবে হাঁটিয়াই তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন অবশ্য পথ হাঁটায় তাঁহার কোন কষ্ট হইত না। দরিদ্র অসমর্থ ব্যক্তিগণের বিপদে আপদে তিনি যে অন্যের অগোচরে কত দান করিয়া থাকিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কাহারও দুঃখের কথা শুনিলেই তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, তখন কি করিয়া তাহার দুঃখের লাঘব করিবেন, ইহাই যতীন্দ্রনাথের একমাত্র চিন্তা হইত এবং বলা বাহুল্য যে, তাহাকে যে কোন প্রকারেই হউক কিছু সাহায্য করিতে না পারিলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত হইতেন না। আর্ত্তের উপকার করাকেই তিনি একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'সেবা-ধর্ম্ম' এই নীতিতে তিনি আস্থাবান ছিলেন।

কলিকাতায় অমহুটি এণ্ড কোম্পানীতে চাকুরী করিতে করিতে তিনি মজঃফরপুরে আশী টাকা বেতনে একটি ভাল চাকুরী পান এবং

কলিকাতার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া, তিনি উক্ত কার্য্যে যোগদান করেন। তথায় ব্যারিষ্টার মিঃ কেনেডি সাহেবের ষ্টেনোগ্রাফারের কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইত। মজঃফরপুরে কেনেডি সাহেবের চাকুরীও তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই, কারণ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারে একশত কুড়ি টাকা বেতনের একটি ভাল চাকুরী পাওয়ায়, তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করেন।

বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েটে মিঃ এ-এইচ হুইলার নামক একজন আই-সি-এস-এর অধীনে তাঁহাকে চাকুরী করিতে হইত। সিভিলিয়ান হুইলার সাহেবের তৎকালে বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল এবং তাঁহার নির্দ্দেশেই বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যাবলী তখন একপ্রকার পরিচালিত হইত বলিয়া শুনা যায়। তিনি রাজস্ব বিভাগের একজন সদস্য ছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্টহাণ্ড-টাইপিষ্টের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যতীন্দ্রনাথের মধুর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সকলেই তাঁহাকে ভাল-বাসিতেন। হুইলার সাহেব তাঁহার নির্ভুল ও সুন্দরভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া যতীন্দ্রনাথকে খুব পছন্দ ও বিশ্বাস করিতেন। হুইলার সাহেব রাজস্ব বিভাগের সদস্য ছিলেন বলিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজা, মহারাজা ও জমিদারবর্গ তাঁহার সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং যতীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম আলাপ পরিচয় করিতে হইত। কারণ তিনিই সাহেবের ঘরের সম্মুখে বসিয়া কার্য্য করিতেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, দিনাজপুরের মহারাজা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যতীন্দ্রনাথের সৌজন্যতায় মুগ্ধ হইয়া যান এবং তাঁহারা হুইলার

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া যতীন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাইলে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তিনি কেমন আছেন প্রভৃতি অন্যান্য বাবুদের এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। যতীন্দ্রনাথের সরল স্বভাব ও অমায়িক কৌতুকময় ব্যবহারের সহিত যিনি একবার পরিচিত হইয়াছিলেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার চিত্তকে স্থির ও শক্তিমান করিয়াছিল। তখনও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের আগামী পঞ্চাশ বৎসরকাল জননী জন্মভূমিই যেন আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হয় এই বাণী তাঁহার কর্ণে সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইত। তিনি কোথায় 'পথ' তাহার সন্ধানে ছুটিতে লাগিলেন এবং গীতার মূলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভীরু দুর্ব্বল হইয়া অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করাকে প্রাণহীনতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজের মধ্যে অত্যাচারীর সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য সর্ব্বদা পূর্ণ প্রাণশক্তি অনুভব করিতেন।

বাঙ্গলা সরকারের অফিসে কার্য্য করিবার সময় যতীন্দ্রনাথকে প্রতি বৎসর কয়েক মাসের জন্য গরমের সময় দর্জ্জিলিঙ যাইতে হইত। একবার যতীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিঙ যাইতেছেন পথে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে ট্রেণের কামরায় একটি শিশু তৃষ্ণায় জলের জন্য কাঁদিতেছিল। শিশুটির পিতা জল আনিতে যাইলে যদি ট্রেণ ছাড়িয়া দেয় এই ভয়ে ষ্টেশনের কল হইতে জল আনিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, যতীন্দ্রনাথ তাহার গ্লাস লইয়া শিশুটির জন্য জল আনিতে গেলেন। কল হইতে জল লইয়া আসিতেছেন

এমন সময় ট্রেণটি ছাড়িয়া দিল; তিনি তাড়াতাড়ি জল লইয়া দৌড়াইয়া ট্রেণে উঠিতে যাইবেন এমন সময় তথায় দণ্ডায়মান তিনজন গোরা সৈনিকের একজনের গায়ে বোধ হয় ধাক্কা লাগিয়া যায় কিম্বা গায়ে একটু জল পড়িয়া যায়। সৈনিকগণ তখন যতীন্দ্রনাথকে ধরিয়া এরূপ ধাক্কা দিল যে তিনি পড়িয়া গেলেন এবং তাহার কাঁচের গ্লাসও ভাঙ্গিয়া গেল। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর প্রতি এইরূপ অত্যাচার তাহারা চিরকালই করিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালীও উহা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত যতীন্দ্রনাথের আর এই অন্যায় সহ্য হইল না, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের আচরণের প্রতিবাদ করিতেই তাহারা তিনজনে 'কালা' ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে গালাগালি করিয়া যতীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিল। যতীন্দ্রনাথ সাধারণ ভারতবাসীর ন্যায় প্রহৃত হইয়া, গালাগালি শুনিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাইবেন সে পাত্র তিনি নন। তিনি স্বামীজীর কথা স্মরণ করিলেন "তোমার গালে এক চড় যদি মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে, ইহকালের নরকভোগ, পরকালেও তাই। অন্যায় সহ্য করা গৃহস্থের পক্ষে পাপ—তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

যতীন্দ্রনাথ স্বামীজীর কর্ম্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন না, চারিজন গোরা সৈন্যকে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। এক-দিকে তিনজন সৈন্য অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ একা, এদিকে তিনি দৃকপাত করিলেন না, তিনি তাহাদের সহিত বক্সিং লড়িতে লাগিলেন। একজন বাঙ্গালী যুবক যে বক্সিং (ঘুযোঘুষি) জিমেনাষ্টিক ও কুস্তিতে এত পটু হইতে পারে তাহা তাহারা স্বপনেও কোন দিন চিন্তা করে নাই। বক্সিং

প্রায় পাঁচ মিনিট যাবৎ লড়িবার পর তিনি তিনজন সৈনিকের কাহারও নাক, বা কাহারও মাথার উপর এরূপ ওজনের ঘুঁষি মারেন যে তাহাদের মুখ ও নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের সহিত তাহারা পারিষা উঠিতেছে না দেখিয়া একজন সৈনিক পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাহাকে আঘাত করিলেন ছুরির আঘাতেও যতীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইল না, একাকী খালি হাতে তিনজন গোরা সৈন্যকে ষ্টেশনের প্লাটফরমে শাসিত করিয়া তবে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

ট্রেণ তাঁহার বহু পূর্ব্বে শিলিগুড়ি ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহার আর দার্জ্জিলিং যাওয়া হইল না, তিনি শিলিগুড়িতেই রহিয়া গেলেন। পুলিশ আসিয়া সৈন্যগণকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ হাসপাতালে থাকিয়া তাহারা আরোগ্য হইল এবং যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিয়া দিলেন। উক্ত সৈনিকদের মধ্যে একজন লেফটেন্যাণ্ট ছিলেন; দার্জ্জিলিঙ শহরে এই মোকর্দ্দমার কথা হুইলার সাহেব শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। একজন নিরস্ত্র বাঙ্গালী চারিজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিককে মারিয়া আহত করিয়া পনের দিনের জন্য তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন, ইহাতে লাঞ্ছিত না হইয়া আবার তাহারা আদালতে নালিশ করিতেছে, ইহা হুইলার সাহেব পছন্দ করিলেন না। এই ঘটনা আদালতে যাইলে মামলার বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া জনসাধারণ শ্বেতাঙ্গদের গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করিবে বিবেচনা করিয়া তিনি লেফটেন্যাণ্টকে ডাকিয়া মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলেন এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। হুইলার সাহেবের কথায় মামলা তাহারা প্রত্যাহার করিয়া লয়। হুইলার সাহেব যতীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কি ঘটিয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করেন

অঙ্ক সংখ্যা ৪৭১—৫৫.৩
পরিগ্রহণ সংখ্যা ১১৪২৬
পরিগ্রহণের তারিখ ৩/১২/৫৭

এবং যতীন্দ্রনাথও সমস্ত সত্য কথা তাহাকে বিবৃত করেন। যতীনের কথা শুনিয়া সাহেব হাসিয়া আকুল হইলেন এবং তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, তুমি কয়জনের সহিত লড়িতে পার?

যতীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন যে, তিনি ভাল লোক একজনের সহিতও লড়িতে পারেন না। এই ঘটনার পর যতীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার স্নেহ আরও বৃদ্ধি পায়।

শিলিগুড়ির ঘটনা খবরের কাগজে পড়িয়া যতীন্দ্রনাথের এক মামাতো ভাই চিন্তিত হইয়া সঠিক খবর জানিবার জন্য যতীন্দ্রনাথকে একখানি 'তার' করেন। তারের উত্তরে তিনি লেখেন যে "তিনজন গোরা সৈনিককে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।" (**Three military aggressors substantially taught**).

কলিকাতার রাস্তায় আরও কয়েকবার অনিবার্য্য কারণে যতীন্দ্রনাথকে শ্বেতাঙ্গদের সহিত মারপিট করিতে হইয়াছিল। একদিন এক চানাচুরওয়ালার সহিত একটি বালকের ধাক্কা লাগায়, ফেরিওয়ালার সমস্ত চানাচুর রাস্তায় পড়িয়া যায়। ফেরিওয়ালা বালকটিকে ধরিয়া মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের নিকট প্রহার করিতেছে এবং বহু ব্যক্তি তথায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছে, ঠিক এমনি সময়ে যতীন্দ্রনাথ উক্ত স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। পথে ভীড় দেখিয়া তিনি ব্যাপার কি তাহা জানিবার জন্য ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তথায় যাইয়া যতীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন যে চানাচুরওয়ালা আট-দশ বৎসরের একটি বাঙ্গালী বালকের গলা ধরিয়া আছে এবং তাহাকে চানাচুর ফেলিয়া দিবার জন্য অকথ্য ভাষায় হিন্দুস্থানীতে গালাগালি দিতেছে। যতীন্দ্রনাথ সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়া বালককে

ছাড়িয়া দিতে বলিলেন এবং তাহার যে চানাচুর ক্ষতি হইয়াছে তাহার মূল্য স্বরূপ একটি টাকা তাহার হস্তে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার যে চানাচুর নষ্ট হইয়াছিল, তাহার মূল্য এক টাকার অনধিকই হইবে।

চানাচুরওয়ালা পাঁচ টাকা না দিলে, বালককে ছাড়িবে না বলিল এবং যতীন্দ্রনাথের দেওযা টাকাটি ছুঁডিয়া ফেলিয়া দিল। যতীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি চানাচুরওয়ালার গালে সজোরে এক চড মারিতেই, চানাচুরওয়ালা পডিয়া গেল এবং যতীন্দ্রনাথও ছেলেটিকে তাহার নিকট হইতে ছাডাইয়া লইল।

নিকটস্থ ওয়াই-এম-সি-এ ভবন হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ সমস্ত ঘটনা নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং যতীন্দ্রনাথ চানাচুরওয়ালার নিকট হইতে বালকটিকে ছিনাইয়া লইয়াছে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া আসিয়া চানাচুরওয়ালার পক্ষ লইয়া যতীন্দ্রনাথের বালকটিকে কাডিয়া লওযা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে লাগিল এবং যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে জোর করিয়া পুনরায় বালককে চানাচুরওয়ালার হস্তে দিতে উদ্যত হইয়া কহিল, যেহেতু তুমি চানাচুরওযালা অপেক্ষা বলবান, সেইজন্য অন্যায় করিয়া তুমি অপরাধী বালককে ছিনাইয়া লইতে সাহসী হইলে। যতীন্দ্রনাথ সাহেবের কথার উত্তরে গম্ভীরভাবে বলিলেন আমি তোমার চেযে নিজেকে অধিক বলশালী বলিয়া মনেকরি। (I consider myself stronger than you too.)

যতীন্দ্রনাথ সাহেবকে বলপূর্ব্বক বালককে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। সাহেব কিন্তু নাছোড়বান্দা, বালককে জোর করিয়া যতীন্দ্রনাথের

নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যতীন্দ্রনাথ বলিলেন যে তিনি যখন একবার বালককে আশ্রয় দিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাণ থাকিতে তিনি উহাকে কখনই ছাড়িবেন না। অতঃপর সাহেবই যতীন্দ্রনাথের উপর বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল, তিনি তাহা প্রতিরোধ করিলেন, অবশেষে দুইজনে ভীষণ মারামারি আরম্ভ হইল। প্রায় পাঁচ মিনিট ধ্বস্তাধ্বস্তির পর যতীন্দ্রনাথ তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। (For your sake please apologise) সাহেব যথেষ্ট হইয়াছে (Enough, Enough) বলিয়া মাপ চাহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি বালকটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং তাহাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজে বাড়ী ফিরিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় শ্বেতাঙ্গ দেখিলে লোকে ভয়ে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিত। চৌরঙ্গীর ফুটপাথ দিয়া তখন কোন দেশীয় ব্যক্তি সাহস করিয়া চলিতে পারিত না এবং কার্জন-পার্কে তখন কোন ভারতবাসীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। যতীন্দ্রনাথ সেইজন্য শ্বেতাঙ্গ দেখিলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে যেন সকল সময়েই ব্যগ্র হইতেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সাহেবদের শক্তি ও সামর্থ্য অপেক্ষা বাঙ্গালীদের শক্তি কোন অংশে কম নহে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না। তাঁহাকে অগ্রে আঘাত করিলে তিনি জীবন দিয়াও তাহার প্রতিশোধ লইবেন, ইহাই ছিল যতীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম এবং কেহ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, তিনি যে কোন প্রকারেই হউক তাহাকে আশ্রয় দিবেন এবং তখন তাহার অনিষ্ট তিনি কখনই হইতে দিবেন না।

তৎকালে সারা ভারতের রাজনীতি আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সশস্ত্র বিদ্রোহ তখন দেশবাসীর কল্পনার বাহিরে ছিল। বাঙ্গলা দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বাণী বরোদা হইতে লইয়া আসেন। বরোদা মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী কর্ম্মচারীগণের অত্যাচারে তখন বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার প্রথম সহিংস অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যাট বৎসর রাজত্বের জুবিলী উৎসব হয়। বোম্বাইয়ের প্লেগ কমিশানার র‍্যাণ্ড সাহেব এবং লেফটেন্যাণ্ট আর্ষ্ট জুবিলী উৎসবের পর রাত্রে যখন লাটপ্রাসাদ হইতে বাড়া ফিরিতে ছিলেন তখন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক তাহারা নিহত হয়। বোম্বাই সহরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে প্রস্তর মূর্ত্তি ছিল, দামোদর চাপেকার তাহা আলকাতরা দিয়া অপরিস্কার করিয়া দেন, কারণ বিদেশী শাসন তাহারা একেবারে পছন্দ করিতেন না। পূর্ব্বোক্ত সাহেব দুইটির হত্যার জন্য দামোদর চাপেকারের প্রাণদণ্ড হয়।

ইহার পূর্ব্বে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক বোম্বাই ও পুণাতে মহারাষ্ট্রিয় অধিনায়ক শিবাজীর স্মৃতিপূজা আরম্ভ করিয়া দেশের মুক্তি মন্ত্র প্রচার করেন। তখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায "উপাধ্যায়" নাম লইয়া বরোদা রাজ্যের সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হন। স্বীয় কর্ম্মকুশলতায় পরে তিনি মহারাজার দেহরক্ষী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সেই সময় বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বরোদা রাজ কলেজে সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তখন শ্রীঅরবিন্দের সহিত যতীন্দ্রনাথের (উপাধ্যায়) বিশেষ বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁহারা দেশমাতৃকার

শৃঙ্খলমুক্তির জন্য বিপ্লবের দ্বারা কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহারা উভয়েই পুণার এক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে ইতিপূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং যতীন্দ্রনাথ (উপাধ্যায়) বরোদা ষ্টেটের কার্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা দেশে বিপ্লবের বাণীবাহকরূপে আগমন করেন। তিনি বাঙ্গলাদেশের দেশপ্রেমিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার জন্য বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা বিবৃত করেন এবং বাঙ্গলার যুবশক্তির যে জাগিয়া উঠিবার বিশেষ প্রয়োজন এই সময় হইয়াছে তাহাও ঘোষণা করেন। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র বিলাতে যখন পড়িতে গিয়াছিলেন, তখন ইংরাজগণ তাহার বর্ণ কাল বলিয়া তাহাকে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত করেন। তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার কয়েকটি স্থানে ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথ (উপাধ্যায়) প্রথমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১০২নং আপার সার্কুলার রোডে একটি 'আখড়া' প্রতিষ্ঠা করেন। এই আখড়া প্রতিষ্ঠার ছয় মাস পরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন এবং তিনি স্বয়ং এই বিষয় লিখিয়াছেন যে "অরবিন্দের কাছে দীক্ষা লইয়া আমি এই কেন্দ্রে আসিয়া যোগদান করি।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদায় সাতশত টাকা বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং কলিকাতায় শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে অবস্থান করেন। যতীন্দ্রনাথ (উপাধ্যায়) সেই সময় যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতার নানাস্থানে গোপনে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেন। তাঁহার এবং প্রমথ

বাবুর চেষ্টায় কলিকাতায় বহু ব্যায়ামাগার এবং গোপনে সমিতির প্রতিষ্ঠা শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে ও তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে যতীন্দ্রনাথ (উপাধ্যায়) মূল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া ব্যায়াম চর্চ্চায় যুবকদিগকে নিয়োজিত করেন।

যতীন্দ্রনাথ সেই সময় বিপ্লবপন্থীদিগের দলভুক্ত হইয়া স্বদেশের কার্য্যে গোপনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উপাধ্যায়) প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে বিপ্লবের কার্য্য চলিবার পর বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হয়। বাঙ্গালী যুবকগণের বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে শক্তিহীন করিবার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গলা দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার চেষ্টা করেন। বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয় এবং বিপ্লবী নেতাগণ তখন এই সুযোগে তাহাদের কার্য্যও পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মাণিকতলায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের পিতা কৃষ্ণদয়াল ঘোষ মহাশয়ের একটি বাগানবাড়ী ছিল; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ উপযুক্ত দলিল সম্পাদন করিয়া উক্ত বাগান-বাড়ীটি (৩২নং মুরারিপুকুর রোড) গুপ্ত সমিতির কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারণ করেন। তথায় ব্যায়াম চর্চ্চা, ধর্ম্মালোচনা এবং রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। নবাগত সভ্যগণকে বিপ্লবের পথে প্রস্তুত করিবার এ একটি প্রধান কেন্দ্র হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথা সময়ে এই বিপ্লবীদলে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখিত 'ভবানী মন্দির' নামক পুস্তকখানি প্রত্যেক সভ্যকে পাঠ করিতে দেওয়া হইত, কারণ উহার মধ্যে কি করিয়া ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে হইবে তাহা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। ভবানীমন্দির পুস্তকে লিখিত প্রণালীতে বারীন্দ্র নাথ ঘোষ মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে বিপ্লববাদীদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই আশ্রমে দেবী ভবানীর উদ্দেশ্যে মন্দির স্থাপনা

করিয়া রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর দল দেশে বিপ্লবের কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই বাগানবাড়ী বিপ্লবীদিগের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হয়।

প্রফুল্লকুমার চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুকে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য পাঠান হয়; তাহারা ভ্রমক্রমে ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া মিসেস্ ও মিস কেনেডির গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে এবং তাহাতে উক্ত মহিলা দুইটি মারা যায়।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল এই ঘটনার পরে মজঃফরপুর হইতে পলাইয়া যায়। প্রফুল্ল সমস্তিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ট্রেণে কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসিতেছিলেন; তিনি সমস্তিপুর ষ্টেশনে প্রফুল্লের সাক্ষাৎ পান এবং তাহার সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা অবগত হন। পরে প্রফুল্লকে ধরিতে যাইলে তিনি "ছিঃ ছিঃ আপনি না বাঙ্গালী? বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীকে ধরিয়ে দিচ্ছেন"। এই কথা কয়টি বলিয়া স্বয়ং গুলী করিয়া আত্মহত্যা করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় বিপ্লবীর গুলীতে নিহত হন। ক্ষুদিরাম ওয়ানী রেলওয়ে ষ্টেশনেই ধরা পড়িয়া যায়। মজঃফরপুরের ঘটনার পর চতুর্দ্দিকেই পুলিশের কড়া পাহারা ছিল; ওয়ানী ষ্টেশনে ক্ষুদিরামের রুক্ষ চুল ও ক্লান্ত শরীর দেখিয়া কয়েকজন কনষ্টেবলের সন্দেহ হয়। ফতে সিং ও শিউ প্রসাদ নামক দুইজন বিহারী তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ক্ষুদিরামের বিচার হয় এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

মুরারীপুকুর উদ্যানে বিপ্লবীদিগের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়; এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ১৩৪নং হ্যারিসন রোড, ২৩নং স্কটস্ লেন,

১৫, গোপীমোহন দত্তের লেন, ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট, ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেও বিপ্লবীগণ থাকিতেন। মজঃফরপুরের ঘটনার পর কলিকাতার পুলিশ ২রা মে তারিখে মুরারীপুকুর উদ্যানে খানাতল্লাস করে এবং বোমা, কার্ত্তুজ, রিভলভার, বোমা প্রস্তুত করিবার আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ও বহু কাগজ পত্র গোয়েন্দা বিভাগের হস্তগত হয় এবং বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, বিভূতি বসু প্রভৃতি বহু বিপ্লবী ধৃত হন। বারীন্দ্র ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট এক স্বীকারোক্তি করেন, তাহাতে কি করিয়া বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং তাহার কর্ম্মপন্থা সমস্তই বাহির হইয়া পড়ে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ও ধৃত হন।

বিপ্লব আন্দোলনের ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার ও কারা-কাহিনী নিম্নে উল্লিখিত হইল :

১লা মে শুক্রবার 'বন্দেমাতরম্' আফিসে অরবিন্দবাবু প্রথম মজঃফর-পুরে হত্যার সংবাদটি পান। শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রথম এই সম্বন্ধে একখানি টেলিগ্রাম তাঁহার হাতে দেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলার কাগজ "এম্পায়ারে" পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব প্রকাশ করিলেন :

"আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত, তাহারা শীঘ্রই গ্রেপ্তার হইবে।"

সেই রাত্রিতে অরবিন্দবাবু গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় (যে বাড়ীর একতালায় নবশক্তি আফিস) নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন, তাঁহার ভগিনী সরোজিনী দেবী ভোর পাঁচটার সময় আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, আর দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ঘরখানি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

ক্রেগান, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্লার্ক, ইনস্পেক্টার বিনোদ গুপ্ত, জনকয়েক সাব-ইনস্পেক্টরের আবির্ভাব হইল। সঙ্গে ছিল লালপাগড়ি কনষ্টেবল ও গোয়েন্দা। খানাতল্লাসের সাক্ষীও ছিল। ইহারা বীর বিক্রমে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিযাছিল; সরোজিনী দেবীর সঙ্গে কি একটু বচসা হওযায় একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ তাহার বুকের উপর পিস্তল ধরিতেও লজ্জা বোধ করে নাই।

অরবিন্দবাবু উঠিয়া বিছানায় বসিয়াছেন. এমন সময় ক্রেগান সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি? (Who is Arobindo Ghose ? Are you so ?)

শ্রীঅরবিন্দ—আজ্ঞে হাঁ—আমিই অরবিন্দ ঘোষ (Yes I am Arobindo Ghose.) ক্রেগান সাহেব অমনি একজন পুলিসকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন।

শ্রীঅরবিন্দ—আমাকে গ্রেফতার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট আছে কি? (Is there any warrant for the arrest)

ক্রেগান—হাঁ, মজঃফরপুরের হত্যা সম্পর্কে আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। (Yes here, in connection with the Muzaffarpore murder.)

শ্রীঅরবিন্দ—ইহা তো খানাতল্লাসের পরওয়ানা (Search warrent) বডি-ওয়ারেণ্ট (ধরিবার পরওয়ানা) আছে কি?

ক্রেগান—বডিওয়ারেণ্ট নাই বটে, তবে—(ব্যঙ্গ ভরে দেখাইল) এই দেখুন? মজঃফরপুরের হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া।

ক্রেগান সার্চ্চ-ওয়ারেণ্টখানি অরবিন্দবাবুকে দেখাইল!

অতঃপর তাঁহার হাতে হাতকড়ি পড়িল, কোমরে দড়ি বাঁধা হইল।

ক্রেগান সাহেব এমনভাবে ব্যবহার করিতে ও কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল—যেন সে কোন হিংস্র পশুর গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার অভদ্রোচিত কথায় ইনস্পেক্টর গুপ্ত যেন কানে কানে কি বলিল। অমনি সাহেব যেন একটু নরম হইয়া পড়িল। পরে জিজ্ঞাসা করিল :

"আপনি নাকি বি, এ, পাশ করিয়াছেন। এরূপ সামান্য ঘরে বাস করা আপনার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে লজ্জাকর নয় কি ?

"I am told you are a Graduate—Is it not disgraceful for an educated man like you to live in such a simple unfurnished room ?

শ্রীঅরবিন্দ—আমি দরিদ্র, সেইজন্য দরিদ্রের ন্যায় থাকি—(**I am poor man and live like a poor man**)

তারপরে ক্রেগান যাহা বলিল তাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। সে সদম্ভে চিৎকার করিয়া বলিল :

(Are you doing all these for becoming rich ?)

"তবে কি ধনী হইবার জন্য এইসব কাণ্ড ঘটাইয়াছেন ?"

শ্রীঅরবিন্দ নীরব রহিলেন—দারিদ্র্য ব্রতের মাহাত্ম্য এইসব স্থূলবুদ্ধি শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবদের সঙ্গে আলোচনা করা তিনি বাহুল্য মনে করিলেন।

তারপরে খানাতল্লাসী আরম্ভ হইয়া প্রায় সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত চলিল। বাক্সের ভিতর হইতে খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া গেল, কিছুই বাদ রহিল না। দুইজন সাক্ষীও সাহেবেরা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। একজনকে দেখা গেল খুবই ক্ষুণ্ণ, আর একজন যেন যুদ্ধ জয় করিতে আসিয়াছেন। খানাতল্লাসীর জিনিষপত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল একটি সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করিব।

শ্রীঅরবিন্দ দক্ষিণেশ্বর হইতে কিছু মাটি আনিয়া কার্ডবোর্ডে রাখিয়াছিলেন। ক্লার্ক সাহেবের এই মাটিতে বড় সন্দেহ হয়। তাহার মনে হয় যে, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন বিস্ফোরক পদার্থ আছে। এ একটু দূর হইতে দেখে, ও একটু সরিয়া দাঁড়ায়। অবশেষে অনেক পরামর্শের পরে স্থির হয় যে, ইহা মাটি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ইহা রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠানো অনাবশ্যক। খানাতল্লাসের সময় পুলিশের শান্তিরক্ষক ক্রেগান ও ক্লার্ক নানারূপ বিদ্রূপ ও উপদেশরাশিতে অরবিন্দবাবুর মনে যে পীড়া দেয়, তাহা বেত্রাঘাত অপেক্ষাও তাঁহাকে বেশী আঘাত করিয়াছিল। নীচের তলায় নবশক্তি-অফিসও খানাতল্লাস হইল। অনেক জিনিষপত্র লইয়া যাওয়া হয় এবং অবশেষে চাবি না পাইয়া একটি লোহার সিন্দুকই থানায় লইয়া যাওয়া হয়। অরবিন্দবাবুর এটর্ণি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের ঘরে খানাতল্লাসীর সময় উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আবেদনও অগ্রাহ্য হয়।

ইহার পর তাঁহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়—রয়েড্ স্ট্রীটের আই, বি, অফিসে; সেখানে তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটান। এই বিভাগে রামসদয় মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন সকলের উপরে কর্ত্তা। কিন্তু সামশুল আলম সাহেবও বাহাদুর হইতে চাহেন। সমস্ত প্রসংশাটাই রামসদয় বাবুর উপর পড়িল! ইহা তাঁহার মনঃপুত হয় নাই; তিনি শেষ পর্য্যন্ত অরবিন্দবাবুকে ধর্ম্মোপদেশ শুনাইয়া বাধ্য করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি বলেন:

"দেখুন অরবিন্দবাবু, হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্মের মূলসূত্র—একই। হিন্দুদের ওঙ্কারের তিনটি অক্ষর, অ, উ, ম, এর সঙ্গে কোরাণের তিন অক্ষর অ, ল, ম এর বেশ মিল আছে। সত্যই ধর্ম্ম—সত্য কথা বলিতে ভয় কি?"

বলিতে বলিতে তিনি একেবারে বিভোর হইয়া গেলেন। বক্তৃতা ও উপদেশ যেন ফুরায়ই না—খৈএর মত ফুটিতে লাগিল। তারপর একটু অন্যমনস্ক করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আপনি আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, ইহা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।"

অরবিন্দবাবু—দেখুন, বাগান আমারও যেমন, আমার ভাইয়েরও তেমনি—আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর আপনি কোথায় পাইলেন?

সামশুল—না না, আমি বলিতেছি, যদি তাহা করিয়া থাকেন—

পরে আরও বলেন—দেখুন, জীবনে আমার পিতার উপদেশ—সম্মুখের অন্ন ছাড়িবে না—আর ইহাতেই আমার আজ এত উন্নতি।

অরবিন্দবাবু মনে করিলেন যে, তিনিই বোধ হয় এখন মৌলবীর সম্মুখের অন্ন।

অতঃপরে আসিলেন খোদকর্ত্তা রামসদয়বাবু। কত স্নেহ দরদ দেখাইলেন, খাওয়া শোওয়ার সব ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। অরবিন্দ বাবুর কেবলই মনে হইল, এই রামসদয়বাবু কত বড় একজন অভিনেতা!

অরবিন্দবাবু ও শৈলেন্দ্র বসুকে রাত্রিতে আবার লালবাজার লইয়া যাওয়া হয়। দুজনেই এক ঘরে রহিয়াছেন, সমস্ত রাত্রির জন্য কিছু জলখাবার খাইয়া সারিয়াছেন, এমন সময় দুইজন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন স্বয়ং পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব। দুইজনকে একসঙ্গে রাখায় সাহেব সার্জ্জেণ্টকে একটু ধমকাইলেন। পরে অন্য ঘরে শৈলেন্দ্র বসু স্থানান্তরিত হইলে হ্যালিডে সাহেব অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন:

এইরূপ কাপুরুষোচিত অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কি আপনার লজ্জা হয় না ? (Do you not feel ashamed in being associated with such dastardly crimes.)

শ্রীঅরবিন্দ—আমি লিপ্ত ছিলাম ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার আছে ? (What right have you to consider that I was so connected ?)

হ্যালিডে—আমি ধরিয়া লই নাই ; আমি সবই জানি (I have not so considered, I know it to be so.)

শ্রীঅরবিন্দ—আপনি কি জানেন বা না জানেন, তাহা আমি জানি না, তবে এরূপ হত্যাকাণ্ডের সহিত কোনরূপ সংস্রব আমি অস্বীকার করি। (What you know or do not know—is no concern of mine, but I deny any such connection.) হ্যালিডে সাহেব অরবিন্দের কথায় অতঃপর নীরব রহিলেন।

পরদিন রবিবারও হাজতে কাটিয়া গেল, ইতিমধ্যে অরবিন্দবাবু কয়েকজন অল্পবয়স্ক ছেলেকে—যেমন শচীন সেন, সুরেশ সেন, বীরেন সেন, ধরণী গুপ্তকে—দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ইহাদের সঙ্গে মাসখানেক পরে জেলখানায় আলাপ হয়। সেদিনের অবস্থাটা এই যে, স্নানের জল না পাওয়ায় তিনি অস্নাতই রহিয়া গেলেন। সকালের আহারের মধ্যে ছিল ডাল ভাত সিদ্ধ। জোর করিয়া কয়েক গ্রাস উদরস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাও যেন কিছুতেই গলার নীচে যাইতে চাহিল না, যেন সেই অসিদ্ধ ভাতগুলি বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বিকাল বেলা মুড়ি। এইরূপ কয় দিনই চলিয়াছিল। বাড়ী হইতে আহার যাওয়া

যেন মঞ্জুর হয়, তজ্জন্য অরবিন্দবাবুর উকীল কমিশনারকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মঞ্জুর হয় নাই।

যাহা হউক সোমবার কমিশনার হ্যালিডের কাছে শ্রীঅরবিন্দকে হাজির করা হয়। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শৈলেন্দ্রনাথ বসুকেও হাজির করা হয়, ওদিক হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ইহারা কোন কথাই বলেন নাই।

পঞ্চম দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহিলের কাছে তাহাদের উপস্থিত করা হয়। তিনি কি লিখিলেন, তারপরে জেলে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে ছিল হেম দাস বাবু ও আরও দুইজন। জেলখানায় থাকিবার ওয়ার্ডে তুলিবার আগে স্নান করাইয়া জেলের পোষাক পরাইয়া দেওয়া হইল। পাঁচ দিনের পর স্নান করিয়া স্বর্গ-সুখ পাইলেন। তার পরে জেলের নির্জ্জন ক্ষুদ্র ঘরে (solitary cell) প্রবেশ করেন। সবই বিষাদময়, এই ক্ষুদ্র গৃহে নির্জ্জন বাস অসহনীয়, কিন্তু এইখানেই তাঁহার প্রথম নারায়ণ দর্শন হয়। *

মজঃফরপুরের ঘটনার পর পুলিশ বঙ্গদেশ হইতে বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলী সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং বিপ্লবীদের থাকিবার জন্য কলিকতার অন্যান্য স্থানগুলিও দেওঘরের শীলস্ লজ খানাতল্লাস্ করিয়া বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

বাঘা যতীনও এই বিপ্লব সমিতির সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন কিন্তু মুরারীপুকুর বাগানবাটি খানাতল্লাসীর সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন না; তাঁহার এক মামাতো ভায়ের বিবাহোপলক্ষে অন্যত্র যাওয়ায় সেই

---

* শ্রীঅরবিন্দের হাজত বাস—শ্রীহেমেন্দ্র দাশগুপ্ত

রাত্রে বারীন্দ্রের সহিত তিনি গ্রেপ্তার হন নাই এবং বলা বাহুল্য যে, তিনি গ্রেপ্তার হন নাই বলিয়াই বাঙ্গলা দেশে বিপ্লববাদের বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাঁহার চেষ্টায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা কর্ম্মময় ছিল।

মুরারীপুকুর কেন্দ্র ব্যতীত অন্য স্থান হইতে শচীন্দ্রকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নগেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ সেন, বিভূতি সরকার, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, নিরাপদ রায়, কানাইলাল দত্ত, দীনদয়াল বসু, সুধীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্ন্যাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, বিদ্যারত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, শিশিরকুমার সেন, হেমচন্দ্র সেন ও ধীরেন্দ্রকুমার সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে চারুচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলকৃষ্ণ রায়, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রনাথ নন্দী হৃষিকেশ দাস, দেবব্রত বসু, চন্দ্রনাথ নন্দী ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোট আটত্রিশ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে আলীপুর বোমার মামলা বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। ৩১শে আগষ্ট কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু দেশদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেল হাসপাতালে রিভলভারের গুলীতে নিহত করিয়া ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শ্রীঅরবিন্দের বিপক্ষীয় প্রমাণ দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং পরে তিনি মুক্তি পান। বিপ্লবীগণের মধ্যে অশোক নন্দী পরলোকগমন করেন এবং অন্যান্য বিপ্লবীগণের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের প্রাণদণ্ড হয় পরে আপিলে তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয় এবং উহার পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অন্যান্য সকলেরই কারাদণ্ড হয় এবং কেহ কেহ মুক্তিলাভ করেন।

আলীপুর বোমার মামলায় জেল হাজতে থাকিবার সময় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যোগ অভ্যাস করেন এবং মোকদ্দমার পর মুক্ত হইয়া তিনি রাজনৈতিক জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং ভগবৎ সাধনায় ব্রতী হন।

আলীপুর বোমার মামলায় উনচল্লিশজন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয় এবং জেলের মধ্যে রাজ-সাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে রিভলভারের গুলীতে হত্যা করার অপরাধে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত এবং মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসী হয়। তাঁহাদের মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অতুল সম্মান দেখায় এবং দেশবাসীর হৃদয়ে বিপ্লবাত্মক কার্য্যের স্পৃহা জাগিয়া উঠে। আলীপুর বোমার মামলা যে সময় চলিতেছিল, সেই সময় আরো কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়। নদীয়া জেলার রায়টা গ্রামে এবং হলুদবাড়ী গ্রামে দুইটি ডাকাতি হয়। এই সময় বাঘা-যতীন পশ্চিমবঙ্গে একপ্রকার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; পুলিশ তখন সমগ্র বাঙ্গলাদেশ তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে। যে কোন প্রকারে তাহারা বিপ্লবীদের উচ্ছেদ সাধন করিবে।

এই বোমার মামলা চলিবার সময় সরকার পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাস এবং গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টার সামসুল আলম বিপ্লবীদের বিষ নজরে পড়ে, কারণ তাহাদের জন্যই বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ফাঁসী, দ্বীপান্তর, কারাগার প্রভৃতি কোন কিছুই বিপ্লবীগণকে ভীত করিতে পারে নাই, কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের মিথ্যা ষড়যন্ত্রে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করায়, তাঁহারা বড়ই বিরক্ত হন এবং তাহাদিগকে মিথ্যা মামলা সাজাইতে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহারা এই সামান্য বিপ্লবীদের কথা শুনিবেন কেন?

বিপ্লবীদের কার্য্যে যাহারাই প্রতিবন্ধক হন, তাহাদের হত্যা করাই তখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে ধরিবার চেষ্টা করায় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সার্পেনটাইল লেনের নিকট রিভলভারের গুলীতে নিহত করা হয়। ইহার পর অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকটি ডাকাতি করার প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে রায়টা ও হলুদবাড়ীর কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রায়টা গ্রামে এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাড়ী হইতে দুই হাজার টাকা অপহৃত হয়, কাহাকেও তখন গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই। ইহার পর হুগলী জেলায় মোহরেল গ্রামে শশীভূষণ দে নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করিতে যাইয়া মন্মথ রায়চৌধুরী গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন এবং বিচারে তাঁহার সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী নেত্রা গ্রামে রামতারণ মিত্রের বাড়ীতে আর একটি ডাকাতি হয়। এই স্থানে ডাকাতি করিবার সময় বিপ্লবীগণ মুখোস পরিয়া রিভলভার লইয়া গিয়াছিল এবং টাকা চাহিবামাত্র বাড়ীর মালিক তাহার আলমারির চাবি ডাকাতদের দিয়া দেন এবং তাহারা আড়াই হাজার টাকা লইয়া চলিয়া যায়। বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়— M. N. Roy) এবং নরেন্দ্রনাথ বসু এই ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সামসুল আলম এই ডাকাতির তদন্ত করেন এবং এতদসম্পর্কে বাঘা যতীনের মাতুল শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীও খানাতল্লাস করা হয়।

সামসুল আলাম তখন আর একটি ষড়যন্ত্র মামলা দাঁড় করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন এবং তাহার জন্য বিপ্লবীগণের কার্য্যের

বিশেষ ক্ষতি হয়। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আলীপুর বোমার মামলার সময় বিপ্লবীগণ নিম্নোক্ত গান করিত :

"ওগো সরকারের শ্যাম
তুমি আমাদেরই শূল,
কবে তোমার ভিটেয় চরবে ঘুঘু
দেখবে চোখে সরষে ফুল।"

নেত্রার পর মহারাজপুরে এক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে একটি ডাকাতি হয় এবং কিছু টাকাও অপহৃত হয়, কিন্তু কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হলুদবাড়ীতে একটি ডাকাতি হয় এবং দেড় হাজার টাকা তথায় লুট হয়। মোকদ্দমায় ধৃত শৈলেন দাস যেন কোনরূপ স্বীকারোক্তি না করে, সেই সম্বন্ধে একখানি পত্র হরেন্দ্রনাথ বসু জেল প্রহরীর মারফৎ প্রেরণ করেন এবং আলম ঐ চিঠিখানি প্রাপ্ত হন। এই মামলায় ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী একটি স্বীকারোক্তি করে এবং তাহাতে বাঘা যতীনকে বিভাগীয় নেতা বলিয়া উল্লেখ করে এবং তিনিও এই সমস্ত ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বত্রিশ জন বিপ্লবীর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক একটি বিবৃত দেন। ললিত চক্রবর্ত্তী আরো বলে যে, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে রিভলভার আনিয়া দেয়।

ললিত চক্রবর্ত্তী স্বীকারোক্তি করিয়া নিম্নলিখিত নামোল্লেখ করিয়াছিল।

হাওড়ার বিভাগীয় নেতা—ননীগোপাল সেনগুপ্ত।

হুগলী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর প্রভৃতি স্থানের বিভাগীয় নেতা —যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)।

(১) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (২) ভূষণচন্দ্র মিত্র (৩) কেশবচন্দ্র দে (৪) শরৎচন্দ্র মিত্র (৫) সুরেশচন্দ্র মিত্র (৬) চারুচন্দ্র ঘোষ (৭) তারানাথ চৌধুরী (৮) ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (৯) নিবারণচন্দ্র মজুমদার (১০) নরেন্দ্রনাথ বসু (১১) হরিদাস চক্রবর্ত্তী (১২) হেমচন্দ্র সেন (১৩) পবিত্রকুমার দত্ত (১৪) সতীশচন্দ্র সরকার (১৫) শ্রীশচন্দ্র সরকার (১৬) বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী (১৭) চারুচন্দ্র ঘোষ (১৮) শৈলেন্দ্রনাথ দাস (১৯) মন্মথনাথ রায়চৌধুরী (২০) সুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার)।

তিন

বিপ্লবীগণকে উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য যখন সামস্থল আলম পরি-কল্পিত হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বির ও সাক্ষী সংগ্রহ করিতেছিল, তখন তাহাকে ইহধাম হইতে সরাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস, যিনি বিপ্লবীদের নিষেধ সত্ত্বেও আলীপুর বোমার মামলা পরিচালনা করেন, তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী খুলনা জেলার শোভনা গ্রাম নিবাসী চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক আলীপুরের আদালত প্রাঙ্গণে রিভলভারের গুলীতে নিহত হন। হত্যা করিবার পর চারুচন্দ্র ধরা পড়িয়া যায় এবং ধৃত হইবার পর বলিয়া উঠে যে, "আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।" বিচারের সময় চারুচন্দ্র কোন ব্যারিষ্টার দেন নাই বা কোন জেরা পর্য্যন্ত করেন নাই। বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী (২৪শে জানুয়ারী?) সামস্থল আলম যখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত হইতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন, তখন বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামক আঠারো বৎসর বয়স্ক এক কিশোর তাহাকে রিভলভারের গুলীতে নিহত করে। গুলী করিবার সময় সিঁড়িতে তখন কেহই ছিল না এবং ইচ্ছা করিলে বীরেন্দ্র ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তখন সে এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাস্তায় বাহির হইয়াও সে গুলী ছুঁড়িতে থাকে। অস্ত্রধারী কনষ্টেবল ধুরা সিং তাঁহাকে ধরিতে আসে কিন্তু ধীরেন্দ্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার ছুঁড়ে এবং রিভলভারের গুলী তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়; তখন প্রাণভয়ে

সে পলাইয়া যায়। অতঃপর হাইকোর্টের একজন বিহারী চাপরাশী রামাধিন সিং ও রামজানি সিং পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। গ্রেপ্তার হইবার পর তিনি কিছু বলিতে অস্বীকার করেন।

পরদিন পুলিশ বীরেন্দ্রর ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের ৬১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং তথা হইতেও কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায়। এই সময় পুলিস হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার জন্য যে সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম পাইয়াছিল, তাহাদের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে।

বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট এক স্বীকারোক্তি করিয়া বলে যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কর্ত্তৃক সে সামসুল আলমকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পুলিশ ২০শে জানুয়ারী বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁহার মামাদের ২৭৫নং অপার চিৎপুর রোডস্থ বাড়ী (ডাঃ হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় এই বাড়ীতে থাকিতেন), ৫৯, বেনিয়াটোলা লেনস্থ বাড়ী (অনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বাড়ীতে থাকিতেন) এবং কৃষ্ণনগরের বাড়ী (যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বাড়ীতে থাকিতেন) পুলিসে খানাতল্লাস করে। সেই সময় বাঘা যতীনের এক মামা অসুস্থ হইয়া হেমন্তবাবুর কলিকাতার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন যুবককে লইয়া তখন দিবা রাত্র তাঁহার মামার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। বীরেন্দ্রনাথও উক্ত শুশ্রূষাকারীদের অন্যতম ছিল বলিয়া পুলিশ বীরেনের স্বীকারোক্তিতে যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে। যতীন্দ্রনাথ যে ঘরে থাকিতেন তাহা খানাতল্লাসী করিবার সময় পুলিস একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হয়; উহাতে "পুলিশের কাছ হইতে কি করিয়া সতর্ক থাকিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে

নির্দ্দেশ ছিল।" * পুলিশের ডেপুটি কমিশনার টেগার্ট সাহেব উক্ত নির্দ্দেশনামা নথিভুক্ত করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন।

বীরেনের স্বীকারোক্তিতে যতীনের ন-মামা অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এবং ছোট-মামা কৃষ্ণনগরের উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মুহুরী নিবারণ মজুমদার গ্রেপ্তার হন। নিবারণ মজুমদারের সহিত সুরেশচন্দ্র মজুমদার কৃষ্ণনগরের আর্য্য ফ্যাক্টরীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সুরেশবাবু তখন হাইকোর্টের উকিল কিশোরীলাল সরকারের ১২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বাস করিতেন। তাহাকেও সামসুল আলমের হত্যা ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়।

বীরেন তাহার স্বীকারোক্তিতে বলে যে, সুরেশবাবু প্রদত্ত রিভলভারের দ্বারা যতীন-দা'র নির্দ্দেশে সে সামসুল আলমকে হত্যা করিয়াছে। যে রিভলভারটি দিয়া বীরেন আলমকে হত্যা করে, উহা একটি ৬৬০৮ নম্বরের ওয়েলভি রিভলভার ছিল। এই রিভলভারটির মালিক ছিলেন জাজপুরের মহকুমা হাকিম পূর্ণচন্দ্র মৌলিক; তিনি কয়েকদিনের জন্য তাঁহার ভগিনীপতি দ্বারকানাথ সরকারের (কিশোরীলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন এবং সুরেশবাবু তখন এই বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার হাতব্যাগ হইতে রিভলভারটি উধাও হয় ও সামসুল আলমকে ঐ রিভলবার দিয়াই নিধন করা হয়। সুরেশবাবু এই বাড়ীতে থাকিতেন বলিয়া পুলিশ কিশোরীবাবুর শ্যামবাজারের ১২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বাড়ীও খানাতল্লাস করে।

পুলিশ আলীপুরের সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যার পর

* A Document with the scheme of formation for the Vigilance Committee.

হইতেই যতীন্দ্রনাথের উপর কড়া-নজর রাখিয়া ছিল এবং তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু চতুর যতীন্দ্রনাথকে তখনও গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ যতীন্দ্রনাথও তখন সরকারের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ২৭শে জানুয়ারী ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের গুপ্তচরবিভাগ তাঁহার নিকট হইতে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করিবার বিশেষ চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য শারীরিক যন্ত্রণা ও আদর-আপ্যায়ন কোন কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। যতীন্দ্রনাথকে লালবাজারে চারিদিন না খাইতে দিয়া লক্-আপে আটকাইয়া রাখা হয় এবং গুপ্তচরবিভাগের দারোগা কুমুদবন্ধু সেন স্বীকারোক্তি না করিলে তাহাকে চির নির্ব্বাসন করা হইবে বলিয়া ভয় দেখায়। কিন্তু বাঘা যতীনকে এই সকল হুমকিতে বশ করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহার নিকট হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ একটি কথাও বাহির করিতে পারে নাই।

একদিন রয়েড ষ্ট্রীটে * একটি সার্জ্জেণ্ট আসিয়া বাঘা-যতীনকে বহু প্রলোভন দেখাইয়া স্বীকারোক্তি আদায় করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। একটি বড় শ্বেত পাথরের টেবিলের দুই ধারে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট কথা-প্রসঙ্গে বলে যে, "যদি তুমি সমস্ত কথা বলিয়া দাও তাহা হইলে ভাল ভাল স্ত্রীলোক পাইবে।"

এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ "চুপ করো রাস্কেল" (Shut up you Rascal) বলিয়া ভীষণ চীৎকার পূর্ব্বক সজোরে টেবিলটি উপর· এরূপ

---

* রয়েড ষ্ট্রীটে পূর্ব্বে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় ছিল; বর্ত্তমানে সেই স্থানেই ডানলপ রবার এণ্ড্ টায়ার কোম্পানীর অফিস অবস্থিত। উক্ত রাস্তার নাম এখন ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট হইয়াছে।

একটি ঘুঁষি মারেন যে শ্বেত পাথরের মোটা টেবিলটি ভাঙ্গিয়া চৌ-চির হইয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের চীৎকার ও রাগতঃ চক্ষু দেখিয়া সার্জ্জেণ্টটি ভয়ে পলাইয়া যায় এবং বাহির হইতে বহু ব্যক্তি তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিতে আসে। তাঁহার অগ্নি-দীপ্ত চক্ষু দেখিয়া তখন কেহ তাহার সহিত কথা বলিতে সাহস করে নাই।

পরে যতীন্দ্রনাথের নিকট কর্তৃপক্ষ ঘটনা কি হইয়াছিল তাহা জানিতে আসিলে তিনি সবিনয়ে বলেন, "আমাকে এইভাবে জ্বালাতন না করিলে আমি আনন্দিত হইব।"

চার দিন যাবৎ লালবাজার লক-আপে থাকিবার পর যতীন্দ্রনাথ, ললিতবাবু এবং নিবারণবাবুকে পুলিশের গাড়ী করিয়া হাওড়া জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হাওড়া জেলে প্রায় সন্ধ্যার সময় তাঁহারা পৌছান, তথায় যাইবার পর জেলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিকট কিছু জিনিস আছে কি-না, তাহা দেখিবার জন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার দিদি, বিনোদবালা দেবীকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যান এবং তথায় শ্রীমদ ভোলানন্দ গিরি মহারাজকে দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তথায় যতীন্দ্রনাথও পরে কলিকাতায় ইন্দুবালা এবং তাঁহার দিদি স্বামী ভোলানন্দ গিরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বাঘা যতীনকে একটি মন্ত্রঃপূত রুদ্রাক্ষ দিয়াছিলেন; যতীন্দ্রনাথ তাহা সকল সময় গলায় পরিয়া থাকিতেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুরুদেবের নাম করিয়া উক্ত মন্ত্রঃপূত রুদ্রাক্ষের জল পান করিতেন।

হাওড়া জেলের কর্তৃপক্ষ যতীন্দ্রনাথের রুদ্রাক্ষটি দেখিয়া একটু সন্দেহের চোখে দেখিলেন এবং উহা তাহাদের নিকট জমা দিয়া জেলে যাইতে হইবে

বলিয়া অকারণ জিদ্ ধরিলেন। বাঘা যতীন মন্ত্রঃপূত রুদ্রাক্ষ কোন মতেই খুলিবেন না দেখিয়া সিপাহীগণ জেলারকে ডাকিয়া আনিল। জেলার সাহেব আসিয়া যতীনকে রুদ্রাক্ষটি খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন, তিনি উহা খুলিয়া রাখিতে পারিবেন না বলিলে, জেলারের সহিত তাঁহার ভীষণ তর্কা-তর্কি চালিতে লাগিল অবশেষে সিপাহীগণ বলপূর্ব্বক উক্ত রুদ্রাক্ষ খুলিতে উদ্যত হইলে যতীন্দ্রনাথ ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন এবং তাহাদিকে বলিলেন যে "আমাকে কেহ স্পর্শ করিও না; জীবন থাকিতে এই রুদ্রাক্ষ কেহ আমার নিকট হইতে লইতে পারিবে না।" যতীন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বাহির হইতে লাগিল; অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে রুদ্রাক্ষ পরিয়াই জেলে লইয়া যাইতে বাধ্য হন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রুদ্রাক্ষের ভয়ে তখন কেহ বাঘা যতীনের নিকট যাইত না।

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে পঞ্চাশজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে "হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা" নামক একটি বড় ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। এই মোকদ্দমায় ললিত চক্রবর্ত্তী ও যতীন্দ্রনাথ হাজরা রাজ-সাক্ষী হইয়াছিল; তাহারা বাঘা যতীনের বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রের কথা বিচারপতির নিকট বলিলেও, গুরুদেবের কৃপায় তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহকুমা হাকিম পূর্ণ মৌলিক মহাশয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধেও বিভলভার চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুভাল ৪৬ জন বিপ্লবীকে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে সোপার্দ্দ করেন। প্রধান বিচারপতি মিঃ ব্রেট সাহেবকে লইয়া ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় এবং বিপ্লবীগণ রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এই অভিযোগ করা হয়। হাইকোর্টের সেসনে বিচার

না হওয়া পর্য্যন্ত বাঘা যতীন ও অন্যান্য বিপ্লবীগণকে একবৎসরের অধিককাল জেল-হাজতে থাকিতে হইয়াছিল। স্যার লরেন্স বীরেন্দ্র গুপ্তের বিবৃতি বা জেলে তাহার সাক্ষ্য যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার যবনিকাপাত হয় এবং প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেন্‌কিন্সের বিচারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ফাঁসিয়া সকল বিপ্লবীই মুক্তিলাভ করেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এম, রায় যতীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। সামস্থল আলমকে হত্যা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথই যে বীরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিল এই স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে জেরা করিতে পুলিস মিঃ রায়কে পীড়াপীড়ি করেন নাই।

মিঃ জে, এন, রায় তাঁহার প্রাথমিক অভিভাষণে বলেন—"যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নেতা; তাঁহার উপর নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও রাজসাহী জেলার ভার ছিল। ননীগোপাল সেনগুপ্ত কলিকাতা ও ২৪ পরগণা এবং আত্মোন্নতি সমিতির জন্য ইন্দ্রনাথ নন্দী অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করিয়া দিতেন।" প্রাথমিক অভিভাষণে এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিলেও বিশেষ দক্ষতার সহিত শেষের দিকে এই সমস্ত প্রত্যাহার করিয়া এরূপ সুন্দরভাবে মোকদ্দমাটি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে পরিচালনা করেন যে সমস্ত ষড়যন্ত্রই ফাঁসিয়া যায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সামসুল আলমকে হত্যা করিবার জন্য বীরেন্দ্র গুপ্তের ফাঁসী হয়। এদিকে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ভাল চাকুরীটি নষ্ট হইয়া যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের জেলাবোর্ডের অধীনে কণ্ট্রাকটারী

করিতে আরম্ভ করেন। জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ যতীন্দ্রনাথ সরকার বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট দিতে তাহারা প্রথমে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়া বহু কষ্টে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র লইয়া মাত্র নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর এই তিনটি জেলাবোর্ডের কার্য্য করিবার অনুমতি পান।

যতীন্দ্রনাথকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জেলাবোর্ডের কার্য্য করিতে হইলেও, তাঁহার বিপ্লবী মন ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। তিনি খুব সন্তর্পণে বাহিরে যে সমস্ত বিপ্লবী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন পূর্ব্বক, যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পুলিসের গুপ্তচর বিভাগও তাঁহার উপর কড়া নজর রাখিয়াছিল এবং তাঁহার গতিবিধি সদা সর্ব্বদা লক্ষ্য করিত। সময় সময় একটু মজা করিবার জন্য তিনি গুপ্তচরদিগকে এইরূপ হয়রাণ করিতেন যে তাহারাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত এবং পরিশেষে বিপদমুক্ত হইবার জন্য তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করিত।

যতীন্দ্রনাথের ন্যায় পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু যুবক বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি কণ্ট্রাকটারী কার্য্যে এক দিনেই তিনটি জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় শতাধিক মাইল অতিক্রম করিতেন। গুপ্তচরগণও তাহার অনুসরণ করিত, কিন্তু অত পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না; তাহারা পথিমধ্যে গত্যন্তর না পাইয়া যতীন্দ্রনাথেরই শরণাপন্ন হইত। রাত্রি বারটার সময় হয়ত যতীন্দ্রনাথ তাঁহার কার্য্য করিয়া যশোহর জেলার ঝিনাইদহে ফিরিয়া আসিতেছেন; পথে মাইলের পর মাইল জঙ্গল অতিক্রম করিবার সময় গুপ্তচরগণ ভীত

হইয়া তাঁহার সহিত রাত্রে একসঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিত। কখনও বা তিনি দয়াপরবশ হইয়া গুপ্তচরগণকে তাঁহার সহিত একত্রে যাইবার অনুমতি দিতেন, কখনও বা একটু মজা করিবার জন্য হঠাৎ এমন অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, যে তাহারা আর যতীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইত না।

কণ্ট্রাকটারী করিবার সময় যতীন্দ্রনাথ ঝিনাইদহে থাকিতেন এবং প্রত্যহ কার্য্য করিয়া অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া গভীর রাত্রে বনের মধ্য দিয়া বাড়ী আসিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ঘোড়া পথিমধ্যে থামিয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, কোন জন্তুর গন্ধ পাইয়াছে তাই যাইতে চাহিতেছে না। তিনি তথায় একটু দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলেন যে একটি বাঘ কয়েকটি বাচ্ছা লইয়া অদূরে খেলা করিতেছে। তাঁহার সহিত বন্দুক ছিল; তিনি নিজের কোটটি খুলিয়া ঘোড়ার চোখে বাঁধিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে ঘোড়া লইয়া আগাইয়া চলিলেন। বাঘটির নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি গুলী ছুঁড়িলেন, বাঘ ধরাশায়ী হইল। তারপর যতীন্দ্রনাথ নিকটে যাইয়া বাঘের বাচ্ছাগুলিকে দেখিয়া তাহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং বহুদিন যাবৎ তাহাদিগকে পুষিয়াছিলেন।

ইহার পর কয়েকমাসের জন্য যতীন্দ্রনাথ দেওঘরে স্ত্রীপুত্র লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায়ও গুপ্তচরদিগের হাত হইতে তিনি নিস্তার পান নাই; বহুবার গুপ্তচরগণ তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ঐরূপভাবে পশ্চাদানুসরণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যতীনকে ব্যস্ত করায় তিনি একজন গুপ্তচরকে একবার এইরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন যে প্রাণভয়ে সে যতীনের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পলাইয়া যায়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে তখনও অগ্রগামী দল প্রবেশ করেন নাই; মডারেটগণই কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় কংগ্রেসের ভিক্ষা-নীতি আদৌ পছন্দ করিতেন না।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-বঙ্গে কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে একটি দল গঠন করিবার জন্য বিশেষ তৎপর হন; এবং যতীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মতিলাল রায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করেন এবং কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গলার বিপ্লবীশক্তিকে পুনর্গঠন করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং স্থির হয় যে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল বৈপ্লবিক সঙ্ঘ আছে, তাঁহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া সমস্ত ঠিক করিতে হইবে।

এই সময় রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতে সহিংস আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য উত্তর ভারতে দল গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি তখন ডেরাডুনে ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে কার্য্য করিতেন এবং তত্রস্থ ইউরোপীয়গণকে বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিতেন। রাসবিহারীও বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন, কিন্তু মুরারীপুকুর উদ্যান যে দিন খানাতল্লাসী করা হয়, তিনি সেই দিন তথায় ছিলেন না, কিন্তু খানাতল্লাসীর সময় উক্ত উদ্যান হইতে রাসবিহারীর দু খানি পত্র পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত পত্র দুইখানি পুলিশের হস্তে পড়ায় শশীভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় রাসবিহারীর বিপদাশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ডেরাডুনে নিজের মাষ্টারী চাকুরীর বদলী হিসাবে পাঠাইয়া দেন।

তথায় অবস্থান করিতে করিতে তিনি বন-বিভাগের একটি চাকুরী পান এবং স্থায়ীভাবে ওই স্থানে থাকিয়া যান।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া দেন এবং কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার নির্দ্দেশ দেন। বিপ্লবীগণ কিন্তু ইহা পছন্দ করেন নাই; বাঙ্গালীর অবস্থা শান্ত হইয়া গিয়াছে এইভাবে বিলাতে প্রচার কার্য্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা না পাইলে যে বাঙ্গলার বিপ্লবীগণ শান্ত হইবে না, তাহা শাসকগণ তখন বুঝিয়াও বুঝেন নাই। রাসবিহারী তখন বিলাতে ইংরাজদের কানে এই কথা পৌছাইবে না ভাবিয়া, তিনি সর্ব্ব প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার আয়োজন করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন সস্ত্রীক শোভাযাত্রা করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাসবিহারী বসু বসন্তকুমার বিশ্বাস নামক এক তরুণকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে পাঠাইয়া দেন এবং তিনি রাসবিহারীর নির্দ্দেশে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া যান। বড়লাট অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান, কিন্তু তাঁহার একজন চোপদার নিহত হয়। *

এই সময় রাসবিহারীর সহিত যতীন্দ্রনাথের কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে বিপ্লব দলগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ও অসাধ্য সাধন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হন। ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের অবসান না হইলে যে দেশের শান্তি হইবে না ইহাই তাঁহারা সকলকে বুঝাইতে

*বিস্তারিত বিবরণ "মহাবিপ্লবী রাসবিহারী" (শ্রীসুধীরকুমার মিত্র লিখিত) নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

লাগিলেন এবং প্রত্যেক দলকে একযোগে কাজ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যায় দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান ও হুগলীর কিয়দংশ ভাসিয়া যায় এবং বহুলোক এই বন্যায় প্রাণ হারায়। যতীন্দ্রবাবু তখন বন্যায় বিধ্বস্ত নরনারীগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। উক্ত বন্যায় সেবাকার্য্য করিবার জন্য মাখনলাল সেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, মতিলাল রায় প্রমুখ বিপ্লবী-গণও অগ্রসর হন; এবং তথায় তাঁহাদের বহু ভাবের আদান প্রদান হয়। তথায় বিপ্লবীগণ স্থির করেন যে, বাঙ্গালার বিপ্লবীদলগুলিকে একত্রিত করিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলাদেশেই বিপ্লব ঘোষণা করিবেন।

বাঙ্গলার বিপ্লবদলের সমস্ত নেতৃত্ব এক প্রকার যতীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়ে; তিনি সমস্ত দলের মধ্যে মিলন করাইয়া দেন এবং একযোগে সকলে বিপ্লবাত্মক কার্য্যে রত হন। বরিশালের নেতা সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), নোয়াখালির নেতা সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, খুলনার নেতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহের নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং আত্মোন্নতি সমিতির নেতা বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধায় যতীন্দ্রনাথের সহিত পুরাপুরিভাবে যোগদান করেন। এই সকল তেজস্বী ও নির্ভীক কর্ম্মিগণকে লইয়া যতীন্দ্রনাথ কার্য্যে অগ্রসর হন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল লিখিয়াছেন যে, "ঠিক বলিতে গেলে বাঙ্গালার এই সময়ে দুইটি মাত্র বিপ্লবদল ছিল; একটির নেতা ছিলেন যতীনবাবু আর দ্বিতীয় দলকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একটি বাঙ্গালার বাহিরে কাজ করিতেছিল, অপরটি বাঙ্গালার ভিতরেই নিজেদের

কর্ম্মের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালার বাহিরে সকল ভার রাসবিহার বসুর উপর ছিল।"

বাঙ্গালায় যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবীগণের অধিনায়ক হইবার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ারে তিনজন বিপ্লবী পুলিশ কর্ম্মচারী হরিপদ দেবকে রিভলভারের গুলিতে নিহত করে, কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পারা যায় নাই। ইহার পর ৩০শে ডিসেম্বর ভদ্রেশ্বরে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতে কেহ নিহত হয় নাই। এই বৎসরই রাজা-বাজার বোমার মামলায় অমৃতলাল হাজরা (ওরফে শশাঙ্ক) ও আরও তিন-জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ২৯৬।১, আপার সার্কুলার রোডে শশাঙ্কের গৃহ খানাতল্লাস করিয়া সিগারেটের টিনের মধ্যে বহু বোমা প্রাপ্ত হয় এবং এই বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য শশাঙ্ককে পনের বৎসরের দ্বীপান্তর হয়।

শশাঙ্কের রাজাবাজারের গৃহ খানাতল্লাস করিয়া বিপ্লব সংক্রান্ত বহু কাগজপত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "স্বাধীনতা পত্র" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় নথিযুক্ত রাসবিহারী বসু রচিত "লিবার্টি" পত্রের উহা অনুরূপ ছিল। এই স্বাধীনতা পত্রে সমস্ত শ্বেতাঙ্গগণের নিধন সাধনই বিপ্লবীগণের একমাত্র কাজ বলিয়া লিখিত ছিল।* এই স্বাধীনতা পত্র হইতে বাঙ্গলার বিপ্লব প্রচেষ্টা তখন একজন নেতার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালনা হইয়াছিল ইহা সমর্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন রাজাবাজার বোমার মামলায় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এইরূপ আভাষ দিয়া-ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন শশাঙ্ক হাজরা যে প্রকারের বোমা প্রস্তুত করিত অনুরূপ বোমা লাহোর, দিল্লী, সিলেট, ময়মনসিংহ,

* General massacre of all foreigners in India.

মেদিনীপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল; ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, উক্ত বোমা সকল একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত না হইলেও, একজনের নির্দ্দেশানুসারে উহা প্রস্তুত হইতেছিল।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রায় এইরূপ:

The circumstances that bombs of this particular type have been used in various places...points to the conclusion that more that one person is engaged in those transaction. The bombs are not the handiwork of one individual, though they may be the work of one controlling mind.

বাঙ্গালাদেশে দ্বিতীয় পর্ব্বের বিপ্লবপ্রচেষ্টা যতীন্দ্রনাথের পরিচালনায় চলিতে থাকে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বরাহনগর, আলমবাজার, বৈদ্যবাটি এবং এড়িয়াদহে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি হয় এবং প্রত্যেক স্থান হইতেই কিছু কিছু অর্থ লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। এই সময় যতীন্দ্রনাথ ও তাহার অন্তরঙ্গ কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধু বরাহনগরে বাস করিতেন। তথায় পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ তাঁহাদের গতিবিধির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে। তখন একজন গুপ্তচরের উপর বিরক্ত হইয়া যতীন্দ্রনাথের সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী পুলিশের সেই গুপ্তচরটিকে রিভলভার দিয়া গুলী করে, সেই গুপ্তচর আহত হইয়া মেডিক্যাল কলেজে একটি বিবৃতি দিয়া বলে যে, যতীন্দ্রনাথ তাহাকে গুলী করিয়াছে। ইহাতে যতীন্দ্রনাথের উপর পুলিশের কিরূপ আক্রোশ ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। যাহা হউক এই ঘটনায় যতীন্দ্রনাথের কিছুই হয় নাই।

রাজাবাজার বোমার মামলায় পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের ইন্সপেক্টার নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন বলিয়া তাহাকে শোভা-

বাজারের মোড়ে (চিৎপুর রোড ও গ্রে ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে) ট্রাম হইতে অবতরণ করিবার সময় দুইজন বিপ্লবী কর্তৃক রিভলভারের গুলীতে নিহত হয়। একজন পলাইয়া যায়, আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্তের দৌহিত্র নির্ম্মলকান্তি রায়। তিনি পলাইবার সময় অনন্ত তেলী নামক এক দোকানদার কর্তৃক ধৃত হন। নির্ম্মলের হাতে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ছিল, তদ্দ্বারা তিনি অনন্তকে গুলী করিয়া নিহত করেন। নির্ম্মল তখন সেণ্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়িতেন এবং মাণিকতলার একটি মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার দুইবার বিচার হয়; সুবিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং প্রসিদ্ধ এটর্নি হীরেন্দ্র নাথ দত্ত নির্ম্মলের পক্ষ সমর্থন করেন, দুইবারই তিনি অধিকাংশ জুরীর মতে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পান। দ্বিতীয় বার জজ পুর্ণবিচারের কথা বলে, কিন্তু তৃতীয়বার (৮ই এপ্রিল ১৯১৪) সরকার পক্ষ আর বিচার প্রার্থনা না করিয়া, মামলাটি একবারে তুলিয়া লয়।

ইহার পর পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার জন্য, তাহার বাড়িতে বোমা ফেলা হয়, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া যান; পুলিশের একজন হেড কনষ্টেবল নিহত হয় ও দুইজন কনষ্টেবল ভীষণ ভাবে আহত হয়। এই ঘটনায় পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

যতীন্দ্রনাথ এই সময় কয়েক মাসের জন্য স্ত্রীপুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে গিয়াছিলেন। সেই সময় রাসবিহারী বসুও কাশীতে ছিলেন। তথায় উভয়ের প্রত্যহই বিপ্লব-আন্দোলনের বিষয় আলোচনা হইত। তখন কাশীতেও গুপ্তচরগণ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বিরক্ত করে। যতীন

একজন গুপ্তচরকে তাঁহার অনুসরণ না করিতে বলিয়া দেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে যতীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতে ছাড়ে নাই। একদিন রাত্রে তিনি রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে পূর্ব্বোক্ত গুপ্তচরটি নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। যতীন্দ্রনাথ গুপ্তচরের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং তাহাকে নিকটে আসিবার জন্য ডাকিলেন।

যতীন্দ্রনাথের আহ্বানে গুপ্তচরটি নিকটে আসিতেই তিনি একহাতে তাহার হাত ধরিয়া অন্য হাতে একটি রিভলভার তাহার বুকের উপর ধরিয়া বলেন যে, নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন তাহাকে এইরূপ জ্বালাতন করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে পলাইবার ক্ষমতাও নাই এবং মুখের সামনে রিভলভার দেখিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল যে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচরীর নির্দ্দেশে সে এইরূপ করিতেছে। তাহার কথায় যতীন্দ্রনাথের একটু দয়ার উদ্রেগ হইল, গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আর কখনও আমার পিছু লইবে ?"

গুপ্তচরটি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিন তাহাকে হত্যা না করিতে নিষেধ করিল এবং শপথ করিল, জীবনে আর কখনও সে তাঁহার সম্মুখ দিয়া পথ চলিবে না। যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"তোমার মতন নিকৃষ্ট জীবকে মারিয়া আমি আমার হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাই না ; যাও আজ ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু আর কখনও যেন তোমাকে আমার সামনে না দেখি।" গুপ্তচর যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া গেল এবং আর কখনও সে তাঁহার নিকট আসে নাই।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বড়লাট আসিবেন স্থির হইয়াছিল এবং তজ্জন্য পুলিশ ইন্সপেক্টার সুরেশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে সতর্কতার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিয়োজিত হন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি যখন হেদুয়ার (আজাদ্ হিন্দ বাগ) নিকটে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইবে, তদ্বিষয়ে অধঃস্তন কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দেশ দান করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে তথায় দেখিয়া তিনি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হন, কারণ চিত্তপ্রিয়ের নামে হুলিয়া বাহির হইয়াছিল এবং তিনি বহু দিন পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া ফেরার হইয়াছিলেন। সুরেশবাবু চিত্তপ্রিয়কে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইতেই, চিত্তপ্রিয় রিভলভার বাহির করিয়া গুলী করে; অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীগণ দৌড়াইয়া সুরেশবাবুর সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়, কিন্তু চিত্তপ্রিয়ের সহিত আরও চারিজন বিপ্লবী ছিল, তাঁহারাও গুলী ছোঁড়েন এবং সুরেশবাবু ঘটনাস্থলেই গুলীর আঘাতে নিহত হয়; অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারী যাহারা তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা ভয়ে পলাইয়া যায়। তখন চিত্তপ্রিয় ও তাঁহার চারজন সঙ্গী কৌশলে পলাইতে সক্ষম হন; পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করে, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনানুযায়ী এই হত্যা সাধিত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে রণদামামা বাজিয়া উঠে; বাঙ্গলার বিপ্লবীগণ সেই সুযোগে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন করিতে তৎপর হন। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় চন্দননগরে রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। যতীন্দ্রনাথ তখন বাঙ্গলার বিপ্লবীগণকে একত্রিত করিতে সচেষ্ট হন এবং উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতীরস্থ একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে গোপন বৈঠক আহ্বান করেন। উক্ত বৈঠকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (এম, এন, রায়), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ), শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মাখনলাল সেন প্রভৃতি বিপ্লবীগণ উপস্থিত ছিলেন। উঁহারা সকলেই যতীন্দ্রনাথকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

এই বৈঠকে গৃহীত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় লিখিয়াছেন---"অবিলম্বে বিপ্লব ঘোষণা করা হইবে স্থির হইল; বাঙ্গলার দশ সহস্র যুবক প্রস্তুত করার ভার অনুশীলন সমিতির উপর থাকিবে এবং সহস্র বোমা তৈয়ার করিবার ভার লইবে চন্দননগর। অর্থাদি সংগ্রহ করা ও স্থানে স্থানে বিপ্লবী সঙ্ঘ স্থাপনের ভার বিপ্লবীগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।"

এই গোপন বৈঠকের পর বাঘা যতীন অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বিপ্লব প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য নূতন নূতন বিপ্লবী সঙ্ঘ গঠন করিতে প্রয়াস পান এবং ভগবানও তাঁহাদের একটি সুযোগ দেন, সেই সুযোগে বাঙ্গলার বিপ্লব প্রচেষ্টা এক নূতন আকার ধারণ করে।

বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র সরকার ডালহৌসী স্কোয়ারে অবস্থিত ভ্যান্সিটার্ট

রোতে ইংরাজ অস্ত্র বিক্রেতা রডা এণ্ড কোম্পানীতে চাকুরী করিত। এই কোম্পানী আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে অস্ত্র আমদানী করিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করিত। এই কোম্পানীর "ট্যাকটিসিয়ান্" (S. S. Tactician) নামক জাহাজে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে ২০২ বাক্স অস্ত্র কলিকাতায় আসিযা পৌছে।

তখন মিঃ প্রাইক (Mr. S. Pryke) রডা কোম্পানীর বড সাহেব ছিলেন। তিনি শ্রীশবাবুকে (তাঁহার ডাক নাম হাবু) 'ট্যাকটিসিয়ান্' জাহাজে আগত মালগুলি কলিকাতা কাষ্টম হাউস হইতে ছাড়-পত্র লইয়া জাহাজ হইতে খালাস করিয়া কোম্পানীর গুদামে লইয়া আসিতে বলেন।

শ্রীশবাবু সাহেবের নির্দ্দেশমত কাষ্টম হাউস্ হইতে অস্ত্র ও গুলী বারুদের ২০২ বাক্স মাল খালাস করিয়া সাতটি গরুর গাডিতে বোঝাই করেন। এই মালগুলির মধ্যে ২০১টিতে গুলী এবং একটিতে পঞ্চাশটি মশার পিস্তল ছিল। শ্রীশবাবু ছয়খানি গরুর গাডিতে করিয়া ১৯২ বাক্স মাল লইয়া কোম্পানীর গুদামে উপস্থিত হইলেন। বড় সাহেব বাকী দশ বাক্স মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, এখুনি মাল আনিয়া দিতেছি বলিয়া তিনি পুনরায় বাহির যান, কিন্তু আর অফিসে না ফিরিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন।

শ্রীশবাবু দশটি বাক্স সমেত ঐ গরুর গাড়িটিকে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও মলঙ্গা লেনের সংযোগ স্থলে লইয়া গিয়া, তথায় একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তন্মধ্যে বাক্সগুলি উঠাইয়া জেলেপাড়া লেনের ভিতর চলিয়া যান। উক্ত দশ বাক্সের মধ্যে একটিতে পঞ্চাশটি মশার পিস্তল এবং অন্য নয়টি ৪৬০০০ হাজার গুলী করিবার উপকরণ বাক্সের মধ্যে

ছিল ; এই পঞ্চাশটি পিস্তল পরে বিপ্লবীদিগের নয়টি কেন্দ্রে বিতরিত হয় এবং বহু হত্যা ও ডাকাতিতে উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

রডা কোম্পানীর এই পিস্তলগুলি খুব বড় আকারের ছিল এবং ইহার বিশেষত্ব ছিল যে, ইহা যে বাক্সে থাকে, সেই বাক্সটি পিস্তলের কুঁদায় লাগাইয়া দিলে, তাহা রাইফেলের ন্যায় কাঁধে রাখিয়া ব্যবহার করা চলিত। এই সম্বন্ধে রাউলট কমিটির রিপোর্টে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"The pistols were of large size 300 bore. The pistols were so constructed and packed that by attaching to the buff, the box containing the pistols, a weapson was produced which could be fired from the shoulder in the same way as rifle."

রডা কোম্পানীর পিস্তল অপহৃত হইবার পর পুলিশ সমগ্র বঙ্গদেশে পিস্তল উদ্ধার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করে ; কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হয়। তখন তাহারা খানাতল্লাস, ধর পাকড়, পশ্চাদানুসরণ প্রভৃতি বাড়াইয়া দিল এবং বিপ্লবীদের গোপন সংবাদ বাহির করিবার জন্য পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ একটি বিরাট আকার ধারণ করিল। পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের ন্যায় বিপ্লবীদের কেন্দ্রও তখন সারা বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় বাঙ্গলার বাহিরেও মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবপন্থিগণ নানাবিধ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন।

বিদেশ হইতে অস্ত্র আনাইবার জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গার্ডেন রীচে

ও বেলিয়াঘাটায় ডাকাতি করিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়; এই সমস্ত রাজনৈতিক ডাকাতি যতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

গার্ডেন রীচে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রথম ডাকাতি হয়। বার্ড কোম্পানীর সাউথ ইণ্ডিয়া জুট মিলের কর্ম্মচারীদিগের বেতন দিবার জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া আঠারো হাজার টাকা লইয়া যাওয়া হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং আরও আটজন বিপ্লবী সহ একখানি পাঞ্জাবীর ট্যাক্সি করিয়া গার্ডেন রীচ সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে, ঘোড়ার গাড়ি থামাইয়া তাঁহারা টাকার থলেটি সংগ্রহ করে। বিপ্লবীগণের হাতে রিভলভার থাকায় কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই।

তাঁহারা ট্যাক্সিতে উঠিলে ট্যাক্সিচালক তাহার গাড়ী চালাইতে অস্বীকার করে; তখন তাঁহারা চালককে প্রহার করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় এবং বিপ্লবী পতিতপাবন ঘোষ উক্ত গাড়ী চালাইয়া বারুইপুরে লইয়া যায়। বারুইপুরে গাড়ীটি খারাপ হইয়া যাইলে তাঁহারা ঐ স্থান হইতে জয়নগর যান এবং তথা হইতে পিয়ালী নদী পার হইয়া হাসনাবাদ দিয়া মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে কলিকাতায় আসেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী বেলিয়াঘাটায় চাউলপটী রোডে ললিতমোহন বৃন্দাবন সাহার দোকানে বিপ্লবীগণ বাইশ হাজার টাকা ডাকাতি করিয়া লইয়া আসেন। ইহাও যতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। বেলিয়াঘাটায় বিপ্লবীগণ ট্যাক্সি করিয়া ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ট্যাক্সি চালক এই ক্ষেত্রেও গাড়ি চালাইতে অস্বীকার করে। তখন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী রিভলভার দিয়া তাহাকে গুলী করে এবং ঘটনাস্থলেই চালক নিহত হয়। পতিতপাবন ঘোষ খুব জোরে

গাড়ী চালাইয়া দেয় এবং বেলিয়াঘাটায় খালের ধারে তাহার মৃতদেহ গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা বৌবাজার ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটে তাঁহাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

উপর্য্যুপরি নযদিনের ব্যবধানে দুইটি ভীষণ ডাকাতি হওযায় পুলিশ খুব চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারে নাই। পরে সুরেশ মুখোপাধ্যাযের তৎপরতায় কয়েকজন বিপ্লবী ধৃত হন, সেইজন্য যতীন্দ্র নাথের নির্দ্দেশে তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেওযা হয়।

যতীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় ৭৩নং পাথুরিযাঘাটা ষ্ট্রীটের একটি বাড়ির দ্বিতলে বাস করিতেন। বিপ্লবী ফণীভূষণ রায়ের নামে ইহা ভাড়া লওয়া হইযাছিল; বাড়িটি পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের ঠিকানায় হইলেও, একটি সরু গলির মধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রাস্তা হইতে বাড়িটিকে দেখা যাইত না এবং বাহিরের কোন কোলাহলও উক্ত বাড়িতে প্রবেশ করিত না। যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী এবং আরও বহু বিপ্লবী এই নির্জ্জন বাড়ীতে প্রায়ই অবস্থান করিত।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ বেলিয়াঘাটা ডাকাতির দুইদিন পরে যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয় পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে কয়েকটি পিস্তল পরিষ্কার করিতেছিলেন এমন সময় নীরদপ্রকাশ হালদার নামক এক গুপ্তচর অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং যতীন্দ্রনাথকে তথায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"যতীনবাবু আপনি এখানে?"

বিপ্লবীগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ তখন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, অধিকন্তু উপর্য্যুপরি দুইটি ডাকাতির কোন সুরাহা করিতে না পারায় সন্দেহভাজন প্রত্যেক বিপ্লবীর উপরে গুপ্তচরগণ কড়া নজর রাখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ নীরদের আবির্ভাবে যতীন্দ্রনাথ যে বিপ্লব-

প্রচেষ্টা সফল করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইয়া যায়, এই ভাবিয়া তিনি চিত্তপ্রিয়কে আদেশ দিলেন "মার" (Shoot him)।

চিত্তপ্রিয়ের হাতেই রিভলভার ছিল বলা মাত্রেই তিনি ঘোড়া টিপিলেন; রিভলভারের গুলী নীরদের কণ্ঠ বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল—সে ধরাশায়ী হইল। যতীন্দ্রনাথ আর তথায় মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া সঙ্গীদের লইয়া ছদ্মবেশে তথা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এই ঘটনার বিষয় কেহই তখন ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।

নীরদের প্রাণ তখনও বহির্গত হয় নাই; সজ্ঞাহীন হইয়া সে পড়িয়া ছিল। দুই ঘণ্টা পর চেতনা হইলে সে হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে রাস্তায় বাহির হইয়া আসে এবং পুলিশকে সমস্ত ঘটনা বলে। অতঃপর জোড়াবাগান থানার ইন্সপেক্টার হিউই সাহেব তাহার চিকিৎসার্থে তাহাকে মেয়ো হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয় এবং তথায় সে মৃত্যুকালীন একটি জবানবন্দীতে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীর নাম করে। দুই দিন হাসপাতালে থাকিয়া তাহার মৃত্যু হয়।

নীরদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতির নামোল্লেখ থাকায় পুলিশ তাঁহাদের দুইজনের নামে হুলিয়া বাহির করে এবং তাঁহাদিগকে ধরিয়া দিলে আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে। এই সমস্ত কারণে যতীন্দ্রনাথের তখন কলিকাতায় বাস করা খুবই বিপজ্জনক হয়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পতিতপাবন ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হীরালাল বিশ্বাস, রাধারমণ প্রামাণিক প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী আলীপুর কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া তখন বিচারাধীন রহিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীভূপতি মজুমদার (বর্ত্তমানে বাঙ্গলার অন্যতম মন্ত্রী)

লিখিয়াছেন : বন্ধু নরেন ভট্টাচার্য্যকে অতর্কিতভাবে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে পুলিশ ধরে ফেল্‌লো। সেই তখন ইন্দো-জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্রের প্রধান যোগাযোগ রক্ষাকারী। চারদিকে একটা হতাশা ঘনীভূত হ'তে লাগল। দাদা আমাদের অনেককে ডেকে বললেন, ওরে আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেলে তো চলবে না, এখন আমার ওকে চাই-ই-চাই। আজ সন্ধ্যায় ওকে যখন আলিপুর থেকে লালবাজারে নিয়ে আসবে, তখন তাকে গাড়ী ভেঙ্গে বার ক'রে আনতে হবে, এর জন্যে দাম দিতে হবে অনেক—কিন্তু সে দাম আমি দেব। সেইদিন কয়েকখানা মোটরে লালবাজার—বেণ্টিং ষ্ট্রীটের ওখান থেকে ডালহৌসী স্কোয়ারের কোণ পর্য্যন্ত আমরা অনেকগুলি যুবক অপেক্ষা করছিলাম।

সেদিন দাদার আদেশে জেল-ভ্যান আক্রমণ করে বার করে আনবার পণ করে আমরা বেরিয়েছিলাম ; সকলেরই মনে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ ; পুলিসের শক্তির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে সকলে প্রস্তুত—কোন্‌খান দিয়ে যে সময় বয়ে যেতে লাগলো খেয়াল ছিল না, এমন সময় জেলখানার ভ্যানের সঙ্গে অনুসরণকারী আমাদেব ছেলে যারা ছিল, তারা এসে বল্‌লে—দুর্ভাগ্য আমাদের, নরেন ভট্টাচার্য্যকে অন্যদিনের মত আজ লালবাজারে আনলে না। তাকে সোজা জেলে নিয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে ফিরলাম। দাদা আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন। বল্লেন—যাই হোক, তোরা যে ঠিক এগিয়ে গিয়েছিলি এই অহঙ্কারই আমার সান্ত্বনা। পরে নরেন জামীনে মুক্ত হ'য়ে আসে, এবং দেশ ছেড়ে নিজের কাজে চলে যেতে সক্ষম হয়।......

যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে মুক্ত করাইবার জন্য যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করেন।

কারণ তাঁহাকে ব্যাটাভিয়া হইতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য তথায় প্রেরণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তিনি চেষ্টা করিয়া নরেন্দ্রকে জামিনে খালাস করিয়া লইলেন এবং জামিনদার মোক্তারের নিকট জামিনের সমস্ত টাকা দিয়া তাঁহাকে ছদ্মবেশে অস্ত্রপ্রেরণের জন্য ব্যাটাভিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন চার্লস্ মার্টিন (Charles Martin) এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

প্রথম ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পর ভারতের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ইহাই অনুকূল সময় বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই বিপ্লবী নেতাগণ ভারতের বাহিরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; ক্যানাডা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সেই সময় 'গদর' দল নাম দিয়া একটি বিপ্লবী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রসিদ্ধ বিপ্লবী হরদয়াল উক্ত দলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। মহাসমরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিপ্লবী নেতাগণ জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় বিপ্লবীগণকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসাহায্য করিতে রাজি হন। সেই সময় বার্লিনে তারকনাথ দাস, হরদয়াল, পিল্লাই, হেরম্ব গুপ্ত, চন্দ্রকান্ত বরকতুল্লা প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবী জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারতবর্ষের যোগসূত্র রক্ষা করেন

প্রাচ্যে বিপ্লবীগণের তখন দুইটি কেন্দ্র ছিল একটি ব্যাটাভিয়ায় এবং অন্যটি ব্যাঙ্ককে। এই দুইটি কেন্দ্র হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব্ব অংশ দিয়া ভারত আক্রমণের একটি পরিকল্পনা হয়। ব্যাটাভিয়ার কেন্দ্রের সহিত বাঙ্গালী বিপ্লবীবৃন্দের এবং ব্যাঙ্ককের কেন্দ্রের

সহিত 'গদর' দলের যোগাযোগ ছিল। ভারতের অভ্যন্তরে উত্তর ভারতে রাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, বিষ্ণু পিংলে এবং বাঙ্গলায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং সমগ্র ভারতে যাহাতে একই সময়ে অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা হয়, তাহার তারিখও নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ এই সম্পর্কে পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়ায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় বিপ্লবীগণকে যে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন তাহা জানান। তিনি আসিবার সময় ব্যাটাভিয়া ও ব্যাঙ্কক এই দুইটি কেন্দ্র দেখিয়া আসেন এবং বলেন যে ব্যাটাভিয়া কেন্দ্রে কার্য্য করিবার জন্য একজন সুদক্ষ এজেন্ট তথায় বিশেষ আবশ্যক। তজ্জন্য যতীন্দ্রনাথ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে হাওড়া যড়যন্ত্র মামলা হইতে জামিনে খালাস করাইয়া "মার্টিন" এই ছদ্মনামে এপ্রিল মাসে ব্যাটাভিয়ায় পাঠাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্ককে পাঠাইয়াছিলেন, পরে অবনী মুখোপাধ্যায়কে পুনরায় জাপানে পাঠান। এইরূপ স্থির হয় যে, অস্ত্র বোঝাই একটি জাহাজ তাহারা সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী হাতিয়া দ্বীপে পাঠাইয়া দিবে।

চার্লস মার্টিন (ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) যথাসময়ে ব্যাটাভিয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং থিয়োডের হেলফারিক (Theodor Helffarich) নামক এক জার্ম্মাণ ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে আমেরিকার ক্যালিফ্রোনিয়া হইতে "মেভারিক" (S. S. Mavarick) নামক একটি জাহাজ ২২শে এপ্রিল তারিখে বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সানপেড্রো (Sun Pedro) বন্দর হইতে ছাড়িয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই করাচীতে গিয়া পৌছিবে।

মার্টিন করাচীতে জাহাজ যাইবে শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন এবং মেভারিক জাহাজটিকে বাঙ্গলায় আনাইবার জন্য তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হেলফারিক তাহার পর সাংহাই-এর জার্ম্মাণ কন্সাল জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়া জাহাজটিকে বাঙ্গলাদেশে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তদনুসারে মেভারিক জাহাজ হনুলুলু হইয়া জাভা অভিমুখে যাত্রা করিল।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে হ্যারি এণ্ড সন্স (Herry & Sons) নামক একটি অফিস খোলা হয়; ইহার সাহায্যেই জার্ম্মানীর সহিত বিপ্লবীগণের গোপন আদান প্রদান চলে এবং মার্টিন তারযোগে এই কোম্পানীতে খবর পাঠান যে, "কাজটি আশা-প্রদ।" এই সময় হ্যারি কোম্পানীর নামে ব্যাটাভিয়ার জার্ম্মান কন্সালের নিকট হইতে টাকাও আসে।

'মেভারিক' জাহাজ বাঙ্গলায় আসিবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া মার্টিন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন দেশে ফিরিয়া আসেন। এই জাহাজখানিতে ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলে চারি শত বার ছুঁড়িবার মতন গুলি এবং দুই লক্ষ টাকা আসিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, মার্টিন প্রভৃতি বিপ্লবীগণ উক্ত অস্ত্রশস্ত্র কি ভাবে সুবিধামত স্থানে নামাইতে পারেন তদ্বিষয়ে স্থির করিতে লাগিলেন। অতঃপর হাতিয়া দ্বীপে মালপত্রগুলি খালাস করিবার ভার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনি তথা হইতে অস্ত্রশস্ত্র তিনভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ কলিকাতায়, এক ভাগ বালেশ্বরে এবং এক ভাগ হাতিয়ায় প্রেরণের পরিকল্পনা করেন।

অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান

রেলওয়ে ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান প্রধান পুলগুলি উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হয় এবং বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও মার্টিনের অধীনে কলিকাতায় বিপ্লবীগণের যে সকল অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহার সাহায্যে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করা হইবে তাহাও স্থির হয়। * যতীন্দ্রনাথ তাহার অনুচর লইয়া বালেশ্বরে চলিয়া যাইবেন, কারণ তাহার বিরুদ্ধে হুলিয়া ছিল এবং পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। যতীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কলিকাতায় বিপ্লবীদলের নেতা হন।

জুন মাসের শেষাশেষি "মেভারিকের" আসিবার কথা ছিল; এবং ১লা জুলাই যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়া যাইবে, ইহাই বিপ্লবীগণ আশা করিয়াছিল, কিন্তু জুন মাস শেষ হইয়া যাইল, "মেভারিক" আসিল না দেখিয়া বিপ্লবীগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই "মেভারিক" ২২শে জুন যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতায় জাভায় আটক হইয়া যায় এবং এক ওলন্দাজ পোত আসিয়া উহা যে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের জন্য প্রেরিত হইযাছে তাহা ধরিয়া ফেলে। 'আনি লার্সেন' এবং 'হেনরী' নামক দুইখানি জাহাজ মেভারিকের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু ঐ দুইটি জাহাজও ধরা পড়িয়া যায়। 'হেনরী' জাহাজে হেরম্ব গুপ্ত ছিলেন, তিনি ধরা পড়িয়া যান। চিকাগোতে বিচারে তাহার দণ্ড হয়।

* যতীন্দ্রনাথ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম অধিকার করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন; সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যতীন্দ্রনাথের নামানুসারে করিবার জন্য একটি প্রস্তাব করেন।

ভারতে অস্ত্র আমদানীর জন্য যখন এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল তখন যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। 'মেভারিকে'র আটক কাহিনী অবগত হইয়া পুলিশ ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী করিতে বিশেষভাবে তৎপর হয়। পুলিশ ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার বিপ্লবীদের অফিস 'হ্যারী এণ্ড সন্স' খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে।

রাসবিহারী বসু মে মাসে জাপানে পৌছিয়াছিলেন, তিনি (Nielson) নেলসন নামক জনৈক জার্ম্মাণের বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন, তথায় অবিনাশ রায় নামক আর একজন বিপ্লবী ছিল; তাঁহারা পুনরায় বঙ্গদেশে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাও সফল হয় নাই।

যতীন্দ্রনাথ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্ককে প্রেরণ করেন; তিনি গোয়া হইতে একখানি টেলিগ্রাম করেন; উহার সূত্র ধরিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে; পরে পুণা জেলের মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করেন।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মার্টিন) মেভারিকের কি হইল, তদ্বিষয়ে খবর লইতে গিয়া, সমস্ত অবগত হন এবং তিনি আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া না আসিয়া ঐ জাহাজেই আমেরিকা চলিয়া যান। তত্রস্থ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি গ্রেপ্তার হন এবং পরবর্ত্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় এই নাম ধারণ করেন।

রাসবিহারী বসুর অনুরোধে নেলসন ১২৯টি অটোমেটিক পিস্তল ও বিশ হাজারের অধিক রাউণ্ড গুলি দুইজন চীনার মারফৎ কাঠের বাক্স করিয়া অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে কলিকাতা শ্রমজীবী সমবায়ের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সাংহাই পুলিশের তৎপরতায় তাহাও ধরা পড়িয়া যায়।

অবনী মুখোপাধ্যায় জাপানে ছিলেন, তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিতে-

ছিলেন ; পথিমধ্যে সিঙ্গাপুরে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি নোট বইতে নেলসনের ঠিকানা পাওয়া যায় এবং সেই সূত্র ধরিয়াই পুলিশ নেলসন কর্ত্তৃক প্রেরিত পিস্তলসহ চীনা ভদ্রলোক দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

ভারতবর্ষব্যাপী প্রচণ্ড ও বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া বৈদেশিক শাসন অপসারিত করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু প্রমুখ বাঙ্গলার বিপ্লবীগণ যে দুঃসাধ্য সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইংরাজশক্তির অপরিসীম ক্ষমতার নিকট আপাতদৃষ্টিতে তাহা পরাভূত হইলেও বিপ্লবীগণের কর্ম্মশক্তি ও আত্মত্যাগ এই মরণাহত জাতির মূর্চ্ছাহত চিত্তে জাগরণ, চাঞ্চল্য ও চেতনা সঞ্চার করে এবং স্বাধীনতার পথে জাতির অগ্রগতি তরান্বিত করিয়া দেয়। শঙ্কা মুঝিযা ফেলিযা যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীগণ যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সিদ্ধির উপরেই ভারতের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক জীবন সংঘটিত হয়। তাঁহারা যে বিপ্লবের বীজ নিজেদের রক্ত দিয়া সুসিঞ্চিত করিয়া যান তাহার ধারাবাহিকতা শেষ পর্য্যন্ত রাসবিহারী বসুই সযত্নে রক্ষা করেন এবং পরবর্ত্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের আমরণ সংগ্রামে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

পাঁচ

গুপ্তচর নীরোদ হালদার নিহত হইবার পর পুলিশের তৎপরতা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় এবং যতীন্দ্রনাথের কলিকাতা ত্যাগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যতীন্দ্রনাথের বন্ধুগণ তাঁহার জন্য চারিদিকে আশ্রয় স্থান খুঁজিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বলিয়া দেন যে "আমার অপর সকল সহকর্ম্মীদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না হইলে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিব না।" এদিকে যতীন্দ্রনাথও গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া সব সময়ই যুদ্ধের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন এবং বলিতেন "আমাকে বিড়ালের মতন কখনই ধরিতে দিব না।"

যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের আশ্রয়ের জন্য যতীনের বন্ধুবর্গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার দত্ত প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কলিকাতার বাহিরে নিরাপদ স্থানের সন্ধান দিতে পারিলেন না। দামোদরের বন্যায় সেবাকার্য্যের সময় যতীন্দ্রনাথ ও তাহার বন্ধুবর্গের সহিত বর্দ্ধমানের মহারাজার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল সেই জন্য প্রবল প্রতিপত্তিশালী বর্দ্ধমানের মহারাজা হয়ত তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারিবেন এই ভরসায় তাঁহারা মহারাজার দ্বারস্থ হইলেন; কিন্তু মহারাজা যতীন্দ্রনাথকে তখন আশ্রয় দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।

হাওড়া অঞ্চলের বিপ্লবী কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অতুলচন্দ্র সেন সেই সময় বাগনান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং তথায়ই থাকিতেন। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মাখনলাল সেন অতুলবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে বাগনানে পাঠাইয়া দেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত,

নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং জ্যোতিষচন্দ্র পালকে সঙ্গে লইয়া বাগনানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীভূপতি মজুমদার (বর্ত্তমানে বাঙ্গলার অন্যতম মন্ত্রী) লিখিয়াছেন: আসাম থেকে সবেমাত্র ফিরেছি—হুকুম এলো দাদার সাথে যেতে হবে। দাদা তখন বাগনান স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীঅতুলচন্দ্র সেনের অতিথি হয়ে আত্মগোপন করছিলেন। আমি ৺ফণী চক্রবর্ত্তী ও আর একজন কলকাতা থেকে পাঁচখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে তিনখানা সাইকেল নিয়ে হাওড়াতে উঠলাম। মাঝে একটা ষ্টেশন থেকে দাদা আর নরেন ভট্টাচার্য্য (এম. এন. রায়) আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। আমরা বালেশ্বরের যাত্রী। পরের ষ্টেশনে দু'জন ফিরিঙ্গি উঠলো; উঠে, যেখানে দাদা ও নরেন বসে ছিলেন, সেখানটায় বসতে চাইলো: তাঁরা অস্বীকার করায় ঘুসি পাকিয়ে যা-তা কুৎসিৎ গালাগালি দিতে আরম্ভ করলো! আমাদের পাঁচজনেরই কাছে পিস্তল রিভলভার ইত্যাদি ছিল। এরূপ অপমান সহ্য করা দাদা ছাড়া বাকী ক'জনের মধ্যে কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না। দাদা আমাদের মনের অবস্থা বুঝে বললেন, কেউ কথা বোলো না—চুপ করে বসে থাকো। তারপর হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বল্লেন—'হুজুর আপনারা রাগ করেন কেন, আপনাদের বসার যায়গা দেব বৈ কি। আমরা কালা আদমী, একসঙ্গে ঘেঁসাঘেঁষী করে বসে যেতে পারবো' বলে তিনি যায়গা ছেড়ে উঠে এসে আমাদের পাশে বসলেন। খড়্গাপুরে ফিরিঙ্গিরা নেমে গেলো। দাদা হেসে বল্লেন—এদের গালাগালি খেয়ে তোরা যে রেগে উঠেছিলি, তোদের লজ্জা হয় না? আমি ওদের দুটোকে একসঙ্গে গাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু আমরা যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আত্মগোপন করে

আছি তা রাগ করার বোকামীতে যে পশু হ'য়ে যেত! আত্মসংযম হারালে এপথে আসবার দরকার কি ছিল?……

যে দিন সন্ধ্যাবেলা যতীন্দ্রনাথ বাগনানে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন রাত্রে অতুল বাবু তাহাদের জন্য একটি বোর্ডিংএ থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন কিন্তু বোর্ডিংএ থাকা নিরাপদ নয় ভাবিয়া কটক ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে চন্দ্র সামুই নামক এক ব্যক্তির টিনের ঘরে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়; সামুই-এর বাগনানে ধানের কারবার ও একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। নিরক্ষর সামুই তাঁহাদের যথাসাধ্য আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিতেন। যতীন্দ্রনাথ এইরূপ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে দুর্জ্জয় সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, চন্দ্র আমাদের মতন লোককে তোমার বাড়িতে তুমি স্থান দিয়াছ; পুলিশ জানিতে পারিলে তোমার ফাঁসি হইবে, তা বোধ হয় তুমি জান না? চন্দ্র হাসিয়া যতীন্দ্রের কথার উত্তরে বলিত যে, আপনাদের উপকার করিয়া ফাঁসিতে মৃত্যু হইলে, স্বর্গলাভ হইবে, পাপ হইবে না।

চন্দ্রকে যতীন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করিতেন এবং প্রায় দশ বার দিন তাহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই স্থানে কাঁথি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লবী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসিবার কথা ছিল এবং তিনি যতীন্দ্রনাথের থাকিবার ব্যবস্থাও ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু যথা সময়ে তিনি বাগনানে উপস্থিত না হওয়ায়, যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র প্রধান নামক এক বলিষ্ঠকায় মাহিষ্য যুবকের সহায়তায় রাত্রে হাঁটিয়া রূপনারায়ণ নদের তটস্থিত বেনাপুর নামক এক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হন। বেনাপুর হইতে রূপনারায়ণ পার হইয়া তাহারা তমলুকের প্রসিদ্ধ বর্গভীমার মন্দিরে যাইয়া উঠেন। এই

মন্দির তমলুকের একটি প্রাচীন কীর্ত্তি; ইহার অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য ও স্থানটি খুব মনোরম দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ কিছুদিন এই স্থানে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তত্রস্থ বিপ্লবী বন্ধু শরৎবাবু মন্দির নিরাপদ নহে বলিয়া তাঁহার অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করেন। এই স্থানে শ্রুতিধর নামে আর একজন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং দুই দিন অবস্থান করিযা ছদ্মবেশে গুইগড়, দোরো, মহিষাদল, কুমারড়া প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান। এই সময় প্রায় এক সপ্তাহ তিনি কাঁথি স্কুলে ছদ্মবেশে শিক্ষকতা কার্য্যও করিয়াছিলেন এবং প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকেন। কাঁথি হইতে তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে আশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহকর্ম্মীদের লইয়া তিনি বালেশ্বর অভিমুখে রওনা হইয়া যান।

বালেশ্বরে হ্যারি এণ্ড সন্সের শাখা "ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম" বলিযা বিপ্লবীদের একটি মনোহারী দোকান ছিল; ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিশ এই দোকান খানাতল্লাসী করে এবং গোপাল নামক একজন বাঙ্গালী যুবককে তথা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইযা যায়। জার্ম্মাণীর সাহায্যে বিপ্লবীগণ সুন্দরবনে অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া পুলিশ পূর্ব্বে যে সংবাদ পাইয়াছিল, এই স্থান হইতে তাহার বহু সন্ধান পাইয়া ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় বিপ্লবীদের হ্যারী এণ্ড সন্স নামক অফিসটি খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকজন বিপ্লবীকেও গ্রেপ্তার করে।

যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই স্থান নিরাপদ নয় ভাবিয়া তিনি বঙ্গোপসাগরের মোহানায় এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। বালেশ্বর হইতে প্রায কুড়ি মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে কোপ্তিপোদা নামক একটি গ্রামে তিনি বাসস্থান

নির্দ্ধারণ করেন। যতীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন কোপ্তিপোদায় থাকিতেন এবং তথা হইতে আরো বারো মাইল দূরে তালদিহী নামক গ্রামে চিত্তপ্রিয় ও জ্যোতিষ থাকিতেন।

পুলিশ তাহাদের অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গীগণকে আনাইলেন এবং মহানদী পার হইযা ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য অঞ্চলের দিকে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ৬ই আগষ্ট রাত্রে যতীন্দ্রনাথ কোপ্তিপোদা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু তখন জ্যোতিষ পাল খুব অসুস্থ থাকায়, তিনি পথ চলিতে সক্ষম ছিলেন না ; সেই জন্য যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইতে পারেন নাই। ৭ই ও ৮ই তারিখে তাহারা বহুদূর চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু জ্যোতিষকে সুস্থ করিয়া লইযা যাইতে তাঁহার একটু দেরী হইল এবং পুলিশও সেইজন্য অনেক সুযোগ ও সুবিধা পাইল।

গোপালের নিকট হইতে কিছু সংবাদ অবগত হইয়া পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ ডেনহ্যাম ও তাঁহার দুইজন ডেপুটি মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ড ময়ূরভঞ্জের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহে ও জঙ্গলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের সন্ধান করিতে আরম্ভ করে। বালেশ্বরে ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়াম খানাতল্লাসী করিবার সময় পুলিশ কাগজ পত্রের মধ্যে "কোপ্তিপোদা" এই কথাটি লেখা দেখিতে পায়, সেইজন্য কোপ্তিপোদা খানাতল্লাস করিতে রওনা হয়। বহু অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ যতীন্দ্রনাথের এই জঙ্গলাকীর্ণ আশ্রয় স্থানটির খবর পাইল, কিন্তু তখন তাঁহারা এই স্থান ছাড়িয়া তালদিহায় চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই। যতীন্দ্রনাথের আশ্রয় স্থানটি খানাতল্লাসী করিয়া চতুর্দ্দিকে গুলী ছুঁড়িবার বহু চিহ্ন এবং সুন্দরবনের একখানি মানচিত্র ও পেনাংএর এক-

খানি সংবাদপত্র হইতে "মেভারিক" জাহাজের আগমন সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের একটি কাটিং প্রাপ্ত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কিলবী সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া বালেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে পুলিশের সহায়তায় ট্রেণের রাস্তা বন্ধ করিয়া দিলেন।

যতীন্দ্রনাথ এ-দিকে তাঁহার সহকর্ম্মীগণসহ অনাহারে অনিদ্রায় বুড়ী বালাম নদী তীরে গোবিন্দপুর নামক একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভাদ্র মাসের স্ফীত নদীতে নৌকা ব্যতীত পারাপারের কোন সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া. তাঁহারা অন্য পারে অবস্থিত সানী সাহু নামক একজন উড়িয়া মাঝিকে, নদী পার করিয়া দিতে বলেন। সে বলিল যে, তাহার ছোট নৌকায় এতগুলি লোককে পার করা চলিবে না। সে যতীন্দ্রনাথকে অদূরে কয়েকটি নৌকার সন্ধান বলিয়া দিল।

তাহার কথামত কিছুদূর যাইয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েকখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তখন কোন মাঝি তথায় ছিল না ; অদূরে একটি জেলে মাছ ধরিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ সেই জেলেটিকে পয়সা দিয়া নদীটি পার হইলেন। জেলে পূর্ব্ব দিন শুনিয়াছিল যে কোন অচেনা বাবু দেখিলে যেন দফাদারকে খবর দেওয়া হয়। পাঁচ জন অচেনা বাবুকে দেখিয়া, তাহারা কোথায় যাইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর ষ্টেশনে যাইব বলিয়া উত্তর দেয় এবং বাঁধ ধরিয়া ষ্টেশনের পথে না যাইয়া তাঁহারা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

জেলে তাঁহাদিগকে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দফাদারকে খবর দেয় এবং "কয়েকজন জার্ম্মাণ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছে" এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যায়। বহু গ্রামবাসী "জার্ম্মাণ" দেখিতে কৌতুহল-

বশে তথায় সমবেত হয় এবং দফাদার, চৌকিদার প্রভৃতির সহিত তাহারাও যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

যতীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নের সময় দামুদ্রা গ্রামে উপস্থিত হন এবং গ্রামবাসী-গণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু জনতা ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া তখন তাহারা পলাইয়া যায় এবং কখনও "চোর অছি" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে উত্যক্ত করিতে থকে। জনতার হাত হইতে নিস্তার পাইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া মরোরঞ্জন জনতার উপর কযেকটি গুলী ছোঁড়ে ; ফলে চৌকিদার ও জনতার সহিত বিপ্লবীবৃন্দের একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজ মোহান্তি নিহত হয় এবং সুদান গিরি নামক এক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়। ঘটনাস্থলে একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু দেখিয়া জনতা পলাইয়া যায় এবং তাঁহারাও এই সুযোগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

ময়ূরভঞ্জের রাস্তা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহারা আর একটি ছোট নদী দেখিতে পান। গোলা-বারুদ ও পিস্তলগুলি একটি পুঁটুলি করিয়া জলে ভিজিবার ভযে মাথার ওপর রাখিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া চসকন্দ নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হন এবং একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাদ কাটিবার জন্য বেশ উঁচু বাঁধ ছিল ; স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া এই জঙ্গলের মধ্যেই তাঁহারা আশ্রয় লইলেন।

বেলা প্রায় তুইটার সময় বালেশ্বরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই খণ্ড যুদ্ধের খবর পৌছিল ; খবর পাইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবী,

সশস্ত্র পুলিশ এবং রদারফোর্ড, টেগার্ট, বার্ড সমভিব্যাহারে বুড়ীবালামের তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া যান; একদল ময়ুরভঞ্জের দিকে আর অন্যদল মেদিনীপুরের রাস্তার দিকে অগ্রসর হন। উভয় দলই বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত জঙ্গল ঘিরিয়া ফেলিল। পশ্চাদ অনুসরণকারী সশস্ত্র পুলিশ দল জঙ্গল ঘেরাও করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতেছে দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, আর তাহাদের বোধ হয় পরিত্রাণ নাই।

অনাহারে অনিদ্রায় ও পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত এই পঞ্চ-বিপ্লবী পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সম্মুখ সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করাকেই শ্রেয় মনে করিলেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বিপ্লবীনেতা বাঘা যতীন তাঁহার চারজন সহকর্ম্মী লইয়া পুলিশের বিরাট বাহিনীর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন; পুলিশ ও সৈন্যদল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দূরপাল্লার বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল এবং যতীন্দ্রনাথ ও তাহার সঙ্গীগণ, পুলিশ যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে পাল্টা গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল।

একদিকে পুলিশবাহিনীর সহিত শতাধিক রাইফেলধারী অশ্বারোহী সৈন্য আর অন্যদিকে মাত্র পাঁচজন বিপ্লবীর গুলিবর্ষণে তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের রণকৌশলে পুলিশবাহিনী ক্রমশঃ হটিতে সুরু করে এবং কয়েকঘণ্টা সংগ্রাম চলিবার পরে তাহাদের ক্ষিপ্রতায় পুলিশবাহিনীর একের পর একজন ধরাশায়ী হইতে থাকে এবং যতীন্দ্রনাথের বহু শত্রু নিধন হয়।

বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল; হঠাৎ পুলিশের একটি গুলী চিত্তপ্রিয়ের বুকে বিদ্ধ হইল। তিনি ভীষণ ভাবে আহত হইলেন; যতীন্দ্রনাথ

কিন্তু টলিলেন না; জলধারার ন্যায় গুলীবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুলিশ ও সৈন্যদের বন্দুকের পরিমাণ যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষা শত গুণ বেশী থাকায় ক্রমশঃ তাহারা একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় আবার যতীন্দ্রনাথের উরুতে একটি গুলী আসিয়া লাগিল; কিন্তু তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ক্রমাগত গুলীবর্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। চিত্তপ্রিয়ের বক্ষ দিয়া তখন প্রচুর রক্তপাত হইতেছিল, তিনি তাহার আহত স্থান বাঁধিয়া দিবার জন্য যেমন তাহাকে কোলে তুলিতে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ একটি গুলী আসিয়া যতীনের পেটে লাগিল; এইবার তিনি গুরুতর ভাবে আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

অন্যান্য বিপ্লবীগণ অল্পাধিক ভাবে সকলেই আহত হইয়াছিলেন এই অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়া, গায়ের সাদা চাদর খুলিয়া সন্ধি করিবার আশায় তাহা উড়াইতে লাগিলেন। শ্বেত পতাকা দেখিয়া পুলিশ ও সৈন্যদল সদলে অগ্রসর হইল; চিত্তপ্রিয়ের আত্মা তখন মরদেহ ছাড়িয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে বিপ্লবীগণের অতুলনীয় সাহস, রণকৌশল ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া ইউরোপীয় অফিসারগণ পর্য্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান। যতীন্দ্রনাথ ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তিনি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জল খাইতে চাহিলেন; বিপ্লবী মনোরঞ্জন নিকটস্থ নদী হইতে চাদর ভিজাইয়া জল আনিয়া তাঁহাকে পান করাইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবী যতীন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন, যতীন্দ্রনাথ তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলেন—"আপনি আসিয়াছেন আমি জানিতাম না; বাঙ্গালী ইন্সপেক্টার মনে করিয়া আমি গুলী ছুঁড়িয়াছি, আপনি কিছু মনে করিবেন না—আপনার ব্যবহারে আমি খুব সন্তুষ্ট জানিবেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যতীন্দ্রনাথের কথায় প্রীত হইলেন। মনোরঞ্জন ও নীরেনের গায়ে বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই; পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। চিত্তপ্রিয়, যতীশ ও যতীন্দ্রনাথের জন্য তিনখানি খাটিয়া আনা হইল এবং তাহাদিগকে খাটিয়ায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মনোরঞ্জন ও নীরেনকে থানায় লইয়া যাইবার সময় যতীন্দ্রনাথ বলিলেন যে দেখুন আমি ও চিত্তপ্রিয় সমস্ত গুলী করিয়াছি; ইহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ; অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন, যেন ইহাদের উপর কোন অবিচার না হয়—আমিই একমাত্র এই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী। (Please see that no injustice is done to these two boys, whatever was done, I am fully responsible for that.)

যতীন্দ্রনাথ ও যতীশকে বালেশ্বর হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। টেগার্ট সাহেব হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন, যতীনের অতুলনীয় সাহস দেখিয়া তাহারও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। পর দিবস প্রাতে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে লোকান্তরে চলিয়া যান এবং বালেশ্বরের যুদ্ধের এইভাবে অবসান হয়।

বালেশ্বরে স্পেশাল ট্রাবুন্যালে নীরেন, মনোরঞ্জন ও যতীশের বিচার ১লা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৫ই অক্টোবর শেষ হয়। সশস্ত্র বিপ্লব সঙ্ঘটন করিবার জন্য নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয় এবং যতীশ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। বালেশ্বরের জজ ম্যাক্‌ফারসন সাহেব, কটকের উকিল রায় বাহাদুর নিমাইচরণ মিত্র এবং সব-জজ রায় সাহেব দয়ানিধি দাস উক্ত ট্রাবুন্যালের সদস্য ছিলেন এবং তাঁহারাই উপরোক্ত দণ্ড দেন।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা তখন কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত

না ; কারণ তাঁহার মৃতদেহ কেহ দেখে নাই এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের হস্তেও উহা দেওয়া হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবীও যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন বলিয়া, দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি সধবার ন্যায় থাকিয়া পরে তাঁহার কুশপুত্তলিকা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দাহ করিয়া, তবে তিনি বিধবার বেশ পরিধান করেন।

সেই জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ জে-এন রায় একবার টেগার্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"কেহ কেহ বলেন যে যতীন্দ্রনাথ মরেন নাই—এ কথা কি সত্য ?" তদুত্তরে সাহেব বলিয়াছিলেন—"আজ্ঞে হাঁ সত্য ; দুর্ভাগ্যের বিষয় যতীন মারা গিয়াছেন।"

টেগার্ট সাহেব কথা প্রসঙ্গে আরো বলেন—"যদিও আমাকে আমার কর্ত্তব্য করিতে হইয়াছে ; তথাপি যতীন্দ্রনাথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী যিনি ট্রেঞ্চের ভিতর হইতে যুদ্ধ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে জীবন দান করেন।" (I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench.) *

স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—যে ধাতুতে শেরসাহ, প্রতাপ সিংহ, প্রতাপাদিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই ধাতুতেই বিদ্রোহী দলের নায়ক যতীন্দ্রনাথ গড়া।

* টেগার্ট সাহেবের এই প্রশংসার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং মৃত্যুকালে সমস্ত ঘটনার জন্য নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে রাজ মহান্তিকে হত্যার জন্য (রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়) অন্যায় ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়। সরকারের মনোরঞ্জনকে ফাঁসি দিবার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করাকে দেশবাসী চিরদিন যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে তাহা সুনিশ্চিত।

সন্ন্যাসী রামদাসের শিষ্য শিবাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইসলাম-ফকিরের শিষ্য জায়গীর পুত্র শেরসাহ ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। সে যুগে জন্মিলে সন্ন্যাসী ভোলানন্দ গিরির শিষ্য যতীন্দ্রনাথ, ঐরূপ একজন জগদ্বিখ্যাত বীরই হইতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ শাসিত নিরস্ত্র ভারতবর্ষে সে অভিনয় সম্ভব নয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়া যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়াছেন। তাঁহার ব্যর্থতা ও প্রাণদান কালপুরুষের অঙ্গুলি সঙ্কেত। যাঁহারা প্রাণ দিয়া জাতিকে এই অভিজ্ঞতা দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বর্গগত বীরের স্মৃতিকে আজ আমরা শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছি।

ছয়

যতীন্দ্রনাথের নির্ভীক ব্যবহার ও তেজস্বিতা সর্ব্বজনবিদিত ; ইহা তিনি উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত হন বলিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা উমেশচন্দ্র একজন স্পষ্টবাদী ও সাত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রথম জীবনে তিনি সাধুহাটী গ্রামে এক সাহেবের নীলকুঠিতে গোমস্তার কার্য্য করিতেন। কিন্তু সত্যবাদী ও স্পষ্টবক্তা উমেশচন্দ্র নীলকর সাহেবের কৃষকদের উপর অত্যাচার দেখিয়া বহুদিন এই কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় গোমস্তার কার্য্য করিয়া তৎকালে বহু বাঙ্গালী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহা করিলে তিনিও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি উক্ত কার্য্য ছাড়িয়া দেন এবং তত্রস্থ জমিদারবাবুদের বাড়ীতে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় শরৎশশী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনিও সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন, বিশেষ করিয়া কবিতা রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তৎকালে তাঁহার ঐ অঞ্চলে কবি বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

উমেশচন্দ্রের চারটি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার তৃতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম খোকা, মধ্যম বিনোদবালা, তৃতীয় যতীন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ। খোকা তাঁহার জীবদ্দশাতে মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করে। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রের জন্ম-গ্রহণের এক বৎসরের মধ্যেই উমেশচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করেন এবং শরৎশশী দেবী সেই সময় শিশু তিনটিকে লইয়া পিত্রালয়ে কয়া গ্রামে চলিয়া আসেন। তখন বিনোদবালার বয়স দশ বৎসর এবং যতীন্দ্রনাথের বয়স পাঁ০ বৎসর হইয়াছিল।

বিনোদবালা দেবী এবং যতীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের মাতা যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিক্ষাই উত্তরকালে তাঁহাদের দুইজনকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। বিনোদবালা মাতার নিকট হইতে সুন্দর কবিতা রচনা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার রচিত অসংখ্য কবিতা এখনও যতীন্দ্রনাথের পুত্র তেজেন্দ্রবাবুর নিকট রক্ষিত আছে। মাত্র একাদশ বর্ষ বয়সে নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদা নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বিনোদেলালা বিবাহ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং তদবধি তিনিও মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথের সহিত বসবাস করেন। যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ দুই বৎসর বয়সে মাতুলালয়ে পরলোকগমন করে। উপর্য্যুপরি কয়েকটি শোকে শরৎশশী দেবী বিশেষ কাতর হইয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

যতীন্দ্রনাথের মাতা তাঁহার একমাত্র পুত্রের সত্বর বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এই শোকাতুরা মহিলার আনন্দের জন্য যতীন্দ্রনাথের মাতুলগণ হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় নিবাসী উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ইন্দুবালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইন্দুবালা দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল এবং মাত্র নয় বৎসর বয়সে ১৩০৪ সালে যতীন্দ্রনাথের সহিত তাহার বিবাহ হয়; যতীন্দ্রনাথ তখন এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স বিবাহের সময় মাত্র ১৮ বৎসর হইয়াছিল।

১৩২২ সালে যতীন্দ্রনাথের প্রথম একটি পুত্র সন্তান হয় তাঁহার নাম অতীন্দ্র : ছেলেটিকে তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং "টবু" বলিয়া আদর করিতেন। এই শিশুটি মাত্র তিন বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয় এবং যতীন্দ্রনাথ সেই সময় সস্ত্রীক শান্তিলাভার্থে বিশ্বনাথ দর্শন করিবার

মানসে কাশী চলিয়া যান ও তথায় কয়েকমাস অবস্থান করেন। কাশী হইতে হরিদ্বারে যান এবং তথায় শ্রীমদ্ ভোলানন্দগিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহার দিদি বিনোদবালা ও সহধর্ম্মিনী ইন্দুবালাও কলিকাতায় ভোলানন্দগিরি মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর ১৩১৩ সালে যতীন্দ্রনাথের একটি কন্যা হয় তাহার নাম আশালতা ; ১৩১৫ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র তেজেন্দ্রনাথ এবং ১৩১৮ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং ইহার পর তিনি আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেন। ভগ্নী বিনোদবালা সেই সময় তাঁহার সংসারের কর্ত্রী ছিলেন এবং তিনিই সমস্ত দেখাশুনা করিতেন। মাতার ন্যায় ভগ্নীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার ভরসাতেই তিনি বিপ্লব-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইযাছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই বিদুষী মহিলা ভয কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না এবং তাঁহার রচিত বহু কবিতা এখনও সযত্নে তেজেনবাবুর গৃহে রক্ষিত আছে। ১৩২২ সালে যতীন্দ্রনাথের দেহ রক্ষার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আশালতার মহেশপুর (যশোহর) নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজেনের ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী উষা দেবীর সহিত এবং কনিষ্ঠ পুত্র বীরেনের বর্দ্ধমান জেলার নন্দীগ্রাম নিবাসী (হাল সাকিন্ ঘাটশিলা) শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতি প্রীতি দেবীর সহিত বিবাহ হয়।

তেজেনবাবুর বর্ত্তমানে তিন পুত্র—রথিন, পৃথিন ও ধৃতিন এবং বীরেনবাবুর তিন কন্যা ও এক পুত্র—মঞ্জুষা, শিখা, জবা ও সৌমেন্দ্র। যতীন্দ্রনাথের পুত্রগণ বর্ত্তমানে কলিকাতা ৪৮নং বালীগঞ্জ প্লেসে বসবাস

করেন এবং এই বাড়িতেই ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁহাদের মাতৃদেবী ইন্দুবালা দেবী ও ১৩৫১ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহাদের পিসিমা বিনোদবালা দেবী পরলোকগমন করেন।

যতীন্দ্রনাথের মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে জীবনের যবনিকাপাত হয়। মানুষের মতন বাঁচিবার অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য তিনি মরজগতের সকল ভয় তুচ্ছ করিয়া পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সফল হন নাই। মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া তিনি যে প্রণালীতে কার্য্য করেন, তাহা সকলে সমর্থন না করিলেও তাঁহার দেশপ্রেম ও একনিষ্ঠ আন্তরিকতা চিরদিনই যে সম্মান পাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই প্রেম ও একনিষ্ঠতা যতীন্দ্রনাথ কোথা হইতে পাইলেন তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদের তিন জনকে স্মরণ করিতে হইবে। প্রথম তাঁহার মাতৃদেবী শরৎশশী দেবী, দ্বিতীয় তাঁহার গুরুদেব শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ এবং তৃতীয় তাঁহার দিদি বিনোদবালা দেবী।

যতীন্দ্রনাথের গুরুদেব তাঁহার শিষ্যবর্গকে প্রত্যহ গীতা পাঠ এবং ছয়টি সদাচার পালন করিবার নির্দ্দেশ দিতেন। গীতা পাঠ করিয়াই যতীন্দ্রনাথ নিষ্কাম ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হন এবং পরহিতে আত্মবিলোপ করিতে সমর্থ হন। মানুষ মায়ায় অভিভূত—যতীন্দ্রনাথ মাতার শিক্ষায় ও গুরুর কৃপায় অবলীলাক্রমে সেই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন "মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্ব্বভূতে ভালবাসা।" যতীন্দ্রনাথ এই আদর্শে সাধারণ পাপ-পুণ্য ও জ্ঞানের অতীত হইয়া কর্ম্ম

পথে অগ্রসর হন, সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহা সফল হয় নাই বলিয়া মনে হইলেও "সর্ব্বভূতে ভালবাসা" এই মহাসত্য কখনও বিফল হয় না—হইতে পারে না।

যতীন্দ্রনাথ বিবাহিত এবং সন্তানাদির পিতা হইয়াও মাযায় আবদ্ধ হন নাই। এই যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইহা তাঁহার গুরুদেবের কৃপায় তিনি লাভ করেন এবং দেশজননীকে তিনি সর্ব্বোতভাবে বরণ করিয়া "ত্বং হি প্রাণা শরীরে" এই মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতি-সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেন। এই যে দেশের অগণিত জনগণের প্রতি 'ভালবাসা' স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতে হইলে—"ইহা কখনও বিফল হয় না"।

তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ও ভগবানে বিশ্বাসী পুরুষ খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তিনি শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কৃপায় লাভ করেন। কারণ তাঁহার শিষ্যবর্গকে তাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি কয়েকটি কর্ম্ম নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ঐগুলি—গালি, শপথ, নিন্দা, পরনারীগমন, মৎস, মাংস, ডিম্ব, মদ্য, চুরি, জুয়াখেলা, ও ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ। তিনি বলিতেন যে, অসাবধানতা বশতঃ পরনারীগমন ব্যতীত উক্ত পাপানুষ্ঠান করিলে এক হাজার বার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে উহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে; কিন্তু পরনারীগমনের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরনারীগমনের তক্ত শুক্র শ্রাদ্ধের সময় পিতৃমাতৃ পিণ্ডোপরি পতিত হয়, ইহাই তিনি শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন।

সন্ন্যাসী ভোলা গিরির শিষ্য যতীন্দ্রনাথ তাঁহার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে অন্তরে গাঁথিয়া লইয়া যে, নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিত্র, মনোবল, অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখিলেই বুঝিতে

পারা যায়। এখনও তাঁহার বহু বিপ্লবী শিষ্য তাঁহারই আশ্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপরই যে জীবন-দর্শন সেই আদর্শে ত্যাগ ও সেবা এই গুরুবাণী প্রচার করিয়া দেশে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

যতীন্দ্রনাথ অমর—তাঁহার গুরু ভোলাগিরি অক্ষয়; সকৃতজ্ঞ জাতীয় চিত্তের অভিনন্দন ও অভিব্যক্তিতে তাঁহারা চিরজীবী হইয়া থাকিবেন।

আত্মগোপনকালীন পত্র

যতীন্দ্রনাথ যখন আত্মগোপন করিযাছিলেন, তখন তাঁহার দিদি শ্রীযুক্তা বিনোদবালা দেবী এবং সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবীর নিকট লিখিত দুইখানি চিঠি :—

[১]

দিদির নিকট চিঠি

ওঁ

৩রা জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আমি বেশ ভাল স্থানে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। কর্ম্মের নিমিত্ত বাহির হইয়াছি ভবিষ্যতে সাক্ষাতাদি কর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছি। শীঘ্রও হইতে পারে কিছু বিলম্বও হইতে পারে। তবে

নিরাশ হইবার বা ভয়ের কোন কারণ দেখি না সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন "নহি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" মার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি—তিনি সমস্ত কর্ম্মে সর্ব্বদা যেমন সাহায্য করিয়াছেন বর্ত্তমান অবস্থায়ও তেমনি সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই—তাঁহারই প্রেরণায় এ কষ্ট সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি তিনিই কোলে লইবেন; আপনি যে মার সন্তান তাঁহার হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া আপন হৃদয়ে বল রাখিয়া যে সকল গচ্ছিত রত্নগুলি আপনার নিকট আছে তাহাদের যাহাতে উদ্দেশ্যানুযায়ী কর্ম্মের উপযোগী করিয়া ভবিষ্যতে মায়ের পূজায় অর্পণ করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিবেন। আপনি ব্যস্ত হইলে ইন্দুদের নিকট কি আশা করেন? আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সমস্তই বুঝেন। সংসারে সমস্তই যে কত অস্থায়ী তাহা আপনি অনেক প্রকারে দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন। এই অস্থায়ী সংসারে অস্থায়ী জীবন যে ধর্ম্মার্থে বিসর্জ্জন করিতে অবকাশ পায় সে তো ভগবান এবং তাহার সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন বিশেষতঃ তাহার মাতৃস্থানীয়া সহোদরা যদি একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে নিজেদের এবং বংশের সৌভাগ্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ধর্ম্মার্থে বহির্গত ব্যক্তির সাধনার সিদ্ধির পূর্ব্বে তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না এবং তাহার মন্ত্রের সাধন পথের সহায়তার নিমিত্ত তাঁহার অবর্ত্তমানে গৃহে বুক বাঁধিয়া ভগবানে নির্ভরতা সহকারে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তিদান করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই জগতে ধন্য এবং সা[illegible]মাতৃস্তন্য পান করিয়াছেন। হা হুতাশ ত সকলেই করিয়া থাকে আপনি আমিও যদি তাহাই করি, তবে আমরা আমাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী শরৎশশীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম কেন? আমরা ত সাধারণের ন্যায় দুর্ব্বল

হৃদয় অবিশ্বাসী সামান্য মায়ের সন্তান নই! আমাদের মা জীবন ভরিয়া কি সকল ব্যাপার হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়া গিয়াছেন একবার ভাবিয়া দেখুন ত আর আজ তিনি জীবিত থাকিলে তিনি স্বয়ং আমাকে আমার কর্ম্মে বরণ করিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহার হস্তে আমাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন আমার সেই মাতৃরূপিণী সহোদরা ও গুরু ভগিনীর কি করা কর্ত্তব্য একটু ভাবিয়া দেখিবেন। আপনিই ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে কোন বিপদের সময় আমাকে লিখিয়াছিলেন "আমাদের অপেক্ষা যিনি তোমাকে বেশী ভালবাসেন তিনিই সর্ব্বদা তোমার কথা ভাবিতেছেন আমরা তোমার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া কি করিব?" আপনার অবস্থা এতদিনে আরও উন্নত হওয়ার কথা। হৃদয়ের বল এখন আরও অধিক হইয়াছে আশা করা যায়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মন শান্ত করিয়া সসন্তান ইন্দুকে রক্ষা করিবেন। সন্তানগুলি যাহাতে মানুষ হয় তাহার চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। কখন কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইলে ভাইদের কাহাকেও স্মরণ করিবেন এবং আমার মত জ্ঞান করিয়া প্রযোজন জানাইবেন অভাব থাকিবে না। কোথায় আছি জানিবার প্রয়োজন নাই পত্র পাইলেন, তাহাও কাহাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রেরিত লোকের নিকট বক্তব্য যদি কিছু থাকে জানাবেন। সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম দিবেন ও আশীর্ব্বাদভাজনগণকে স্নেহাশীষ দিবেন। স্মরণ রাখিবেন বিপদের সময় ধৈর্য্য সহকারে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করাই বিধেয়। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের চরণে সদা মতি রাখিবেন। তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবেন।—

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

প্রণতঃ সেবক

[২]

পত্নীর নিকট চিঠি

পরম কল্যাণবরেষু—

ইন্দু, আমার স্নেহাশীষ লও। তোমাকে আর পৃথক কি লিখিব দিদিকে যে পত্র আমি লিখিলাম উহা পড় ও মর্ম্ম অবগত হও। ভগবদিচ্ছায় আজ ১৪।১৫ বৎসর আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। এই দীর্ঘকাল যখন সময় পাইয়াছি তখনই বহু প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোথায়। অদ্য যে অবস্থা আসিয়াছে সে অবস্থা যে এক সময় আসিবেই এ সম্বন্ধে নানা প্রকারে তোমাকে বুঝাইয়াছি এবং প্রস্তুত থাকিতেও বলিয়াছি। আশা করি তোমার মত ক্ষেত্রে আমার সে সকল শিক্ষার বীজ আশানুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। বহু সহস্রের মধ্যে একজনের নিকট যেরূপ শক্তি, ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তোমার নিকটে প্রকৃতই তাহাই আশা করি। সন্তানগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষের সন্তান বলিয়া পরিচিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিও না। ক্ষণিক দুর্ব্বলতা সকলেরই আসিতে পারে সেরূপ অবস্থায় দিদিকে সাহায্য করিও ও তাহার সাহায্য গ্রহণ করিও। সর্ব্বদা মনে রাখিও যে প্রকৃতি লইয়াই পুরুষ পূর্ণ—যত দূরেই থাকি না কেন তোমার প্রসন্নতা ও শুভেচ্ছারূপ শান্তির সাহায্য যেন সদা পাই। সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেব ও ভগবৎ চরণে তোমার স্বামীর সাধনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিও এবং হৃদয়ে বল রাখিও। ইতি—

স্বপ্ন

[১৩২২ সালে ভাদ্র মাসে বালেশ্বর জেলার চাষাখন্দ-এ বাঘা যতীনের সহিত সশস্ত্র পুলিশদলের এক সংগ্রাম হয়। যতীন্দ্রনাথের স্নেহময়ী ভগিনী শ্রীমতী বিনোদবালা দেবী সেই রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখেন তাহাই সকালে লিপিবদ্ধ করেন। নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :]

একি সর্ব্বাপদ পার অগণ্য অপার
মূরতির সার মূরতি রে।
জিনি নীলোৎপল দল প্রভা নিরমল
শ্যামল বরণ ভাতি রে।
তাহে ঘোর পীত বাস কোটি চন্দ্রাভাস
নেহারি বদন জ্যোতিরে!
আজি কি ছলনা হরি! বুঝিতে না পারি
কি দিব্য মাধুরী হেরি এ,
নাহি শঙ্খ, চক্র, গদা করে পদ্ম কোথা
হেরি নারায়ণ রূপ একি রে?
কিবা মূর্ত্তি করুণার যুক্ত দৃষ্টি কর
কহে নয়ন আসারে তিতি রে,
"দিদি জনমের তরে বিদায় দাও মোরে
আজি নেহার প্রাণের জ্যোতি রে।"
বলি "আয় কোলে আয় ধরা নাহি পাই
চকিতে লুকালি কোথা রে?
হেরি একি অপরূপ নারায়ণ রূপ
কেন আজি মোর জ্যোতি রে?"

নিশা শেষে হেরি একি স্বপ্ন চমৎকার
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে জ্যোতি একাকার ?
তবে কি সে মহা রত্ন নাই এ ধরায় ?

প্রাণাধিক ভাই মম সত্য কিরে নাই ?
উঠিল রে কাঁদি প্রাণ স্বপ্ন অবসানে
আর কি সে হারানিধি পাবনা জীবনে
ভাই সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে
মণি হারা ফণী আমি সে ভ্রাতৃ বিহনে
তোমাহারা দিশেহারা ছুটিয়া বেড়াই
কোথা গেলে পাব তোরে প্রাণাধিক ভাই !

বীরের জীবনব্রত সাধি এ ভারতে
জীবনের নশ্বরত্ব দেখায় জগতে
সত্য কি অমর ধামে গেল চলি ভাই !
মায়ামুগ্ধ প্রাণে বল শান্তি কোথা পাই ?

একাশ্রয় তুমি মোর সংসার আশ্রমে
কেমনে রহিব হেথা তোমার বিহনে ?

নিশিদিন কাঁদে প্রাণ তব গুণ স্মরি
কেন ভাই গেলে মোরে একা পরিহরি ?

আশৈশব সাথী তুমি প্রাণের সোদর !
একসাথে লভিয়াছি মায়ের আদর,
এক মাতৃস্তন্য সুধা পিয়ে প্রাণ ভরি,
পবিত্র জীবন মোরা এ ধরায় ধরি ।

একসাথে ধুলাখেলা করেছি দু'জনে
একসাথে লভি শিক্ষা জননী—সদনে।
একসাথে পিতৃহারা শৈশব সময়ে,
একসাথে মাতৃশোক লভেছি উভয়ে।
গৃহী করি তোমা, আনি গৃহলক্ষ্মী ঘরে ;
পশিলাম কত সুখে সংসার আগারে।
গৃহধর্ম্ম একসাথে করেছি সাধন,
নির্লিপ্ত সংসারী তুমি সাধনার ধন।

মায়ার বাঁধনে কভু বাঁধা না পড়িলে,
বিবেক বৈরাগ্যসহ সংসার করিলে।

আসক্তি বিহীন শুধু স্নেহময় প্রাণ,
মমত্ব স্খলিত চিত্ত উদার মহান্!

স্বার্থহীন ভালবাসা পূরিত অন্তর,
আর্ত্তজনে দয়া দীনহীনে দান আর,
জীবনের নিত্য ব্রত পর উপকার,
ছিল যে উন্নত প্রাণে সাধনা তোমার।

অনিত্য সংসার লীলা জানিয়ে অন্তরে,
মুক্তিপথে চলেছ রে নিরন্তর তরে।

সর্ব্বজয়ী আত্মজয়ী প্রসন্ন মূরতি
সত্য সরলতা মাথা উদার প্রকৃতি।
সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য সাধিতে,
অশৈশব সিদ্ধহস্ত বিদ্যা শিক্ষা হতে,

স্নদৃঢ় সঙ্কল্প ভরা প্রশস্ত হৃদয়
সাহস উদ্যমপূর্ণ সদা কর্ম্মময়,
অসামান্য বলবীর্য্য সহ হৃদিবল
কষ্ট সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য লভিলে সকল।

শৈশব জীবন হতে বিধাতার দয়া,
ভোগস্পৃহা শূন্য প্রাণ সদানন্দ হিয়া,
পিতৃমাতৃ সেবা সুখে বঞ্চিত জীবনে,
বিশ্বসেবা ব্রতে ব্রতী ছিলে প্রাণপণে।

রোগী, শোকী, দুঃখী তরে সদা তব প্রাণ
কাঁদিয়াছ অকাতরে দেছ সেবা, দান।

যৌবনে আকাঙ্ক্ষা উচ্চ পুষিলে অন্তরে,
আশা না পুরিল তব বিদ্যা শিক্ষা করে।
সতত শিক্ষার্থী তরে সকরুণ প্রাণে,
শিক্ষা বিধানিতে অর্থ দানিলে যতনে।

বলিতে উন্নত চিত্তে—“আমার সংসার
ক্ষুদ্রগৃহে নহে শুধু, জগত আমার।”
অমিয় পূরিত সেই সুমধুর কথা,
আর কি শুনিব ভাই, যাবে হৃদি ব্যথা ?

অহর্নিশ বাজে প্রাণে স্মৃতির লহরী,
তোমাহারো সেই গৃহে র'হনু সংসারী।
মানব জন্মের সার ঈশ্বর সাধনা
সাধিলে অন্তরে সেই সত্য উপাসনা,

বাঘা যতীন

পুণ্য পবিত্রতা শান্তি সুবিস্তৃত পথে,
ভ্রমণ করিলে ভাই লয়ে সাথে সাথে।
ঈশ্বরে নির্ভর সদা আত্মসমর্পণ
শিখালে জীবনে যাপি কঠোর জীবন।
দুঃখিনী ভারত মার দুঃখ বিমোচনে,
কতনা করিলে যত্ন অকপট প্রাণে।
সতত গৌরবে চলি মৃত্যুর সোপানে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি অগ্নি বিসর্জ্জনে।
উৎসাহ উদ্যম ভরা কি নির্ভীক চিতে
যুঝিলে জীবন ভরি বিপদের সাথে।
তোমা হেন ভ্রাতৃরত্ন বহু পুণ্য ফলে,
লভেছিনু ভাগ্য দোষে হারাই অকালে।
অমর বাঞ্ছিত রত্ন তুমি, চিনি নাই ?
সেই অনুতাপে আজি মনস্তাপ পাই।
কর্ত্তব্যের গুরুভার লয়েছি মাথায়,
মায়ার নিগড় পরিয়াছি দুটি পায়,
তব শোকানল হৃদে জ্বলিছে প্রখর,
ভীষণ পরীক্ষাময় জীবন আমার।
সবলে চলিতে ভাই প্রতি পদে পদে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে মহা অবসাদে।
তুমি ত জীবনে দিলে উপদেশ কত
এবে দাও শক্তি বহি গুরুভার যত

পরমেশ প্রিয় তুমি তাঁর স্নিগ্ধ কোলে,
তোমাধনে আজি তিনি লয়েছেন তুলে।
লও ভাই তাঁর পদে যাচিয়ে করুণা
মোর তরে দাও বল সহিতে যাতনা।
ইন্দু যে দুঃখিনী আজি তোমার বিহনে
দাও শান্তি বারি তার নিত্য দগ্ধ প্রাণে
অনর্থ সংসার জ্বালা ভুলি সে জীবনে
পায় যেন চিরন্তন আরাধ্য রতনে
চেয়ে মোর জ্যোতিহারা ইন্দু মুখ পানে
শতধা বিদীর্ণ হিয়া ধৈরয না মানে
তিনটি গচ্ছিত রত্ন সমীপে তাহার
দিও শক্তি উপযুক্তরূপে পালিবার
উহাদের মুখ চাহি কাঁদিলে হৃদয়
উপদেশ বাণী তব মনে যেন হয়।
"দিদি!
এ জগতে হাহুতাশ অনেকেই করে
কর কাজ কর্ম্মক্ষেত্রে বুকে বল ধরে
বিফল রোদনে কাল না করি ক্ষেপণ
নিয়ত শ্রীগুরুপদ করিও স্মরণ।
যাহার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাঁহারি ইচ্ছায় যে জন মিলায়,
তা থাকে অভাব তার শোক তাপ নাই।"
আর কি সে কথা কভু শুনিব না ভাই ?

উন্নত জীবন্মুক্ত যতীন্দ্র আমার !
বারেক দেখাও ওই স্বর্গীয় আকার
স্বপনে হেরিনু ভাই যে মূরতি চিন্
সেইরূপে ভাইরূপ হয়েছে কী লীন ?
মুক্তিহেতু করে নর কঠোর সাধন,
আজি করতলে তব সে অমূল্য ধন ।
ধন্য ভাই তুমি মম ধন্য মোর পিতা,
তোমা পুত্রে গর্ভে ধরি ধন্যা মোর মাতা,
বংশের গৌরব তুমি, তব বংশধর
তব কীর্ত্তি স্মরি ধন্য হবে নিরন্তর ।

সমাপ্ত

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র লিখিত অন্যান্য পুস্তক

হুগলী জেলার ইতিহাস

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

জেজুরের মিত্র বংশ

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই

আমাদের বাপুজী

বরণীয় বাঙ্গালী

নয়া-বাঙ্গলা

তীর্থ-সপ্তক

India's National Language